কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

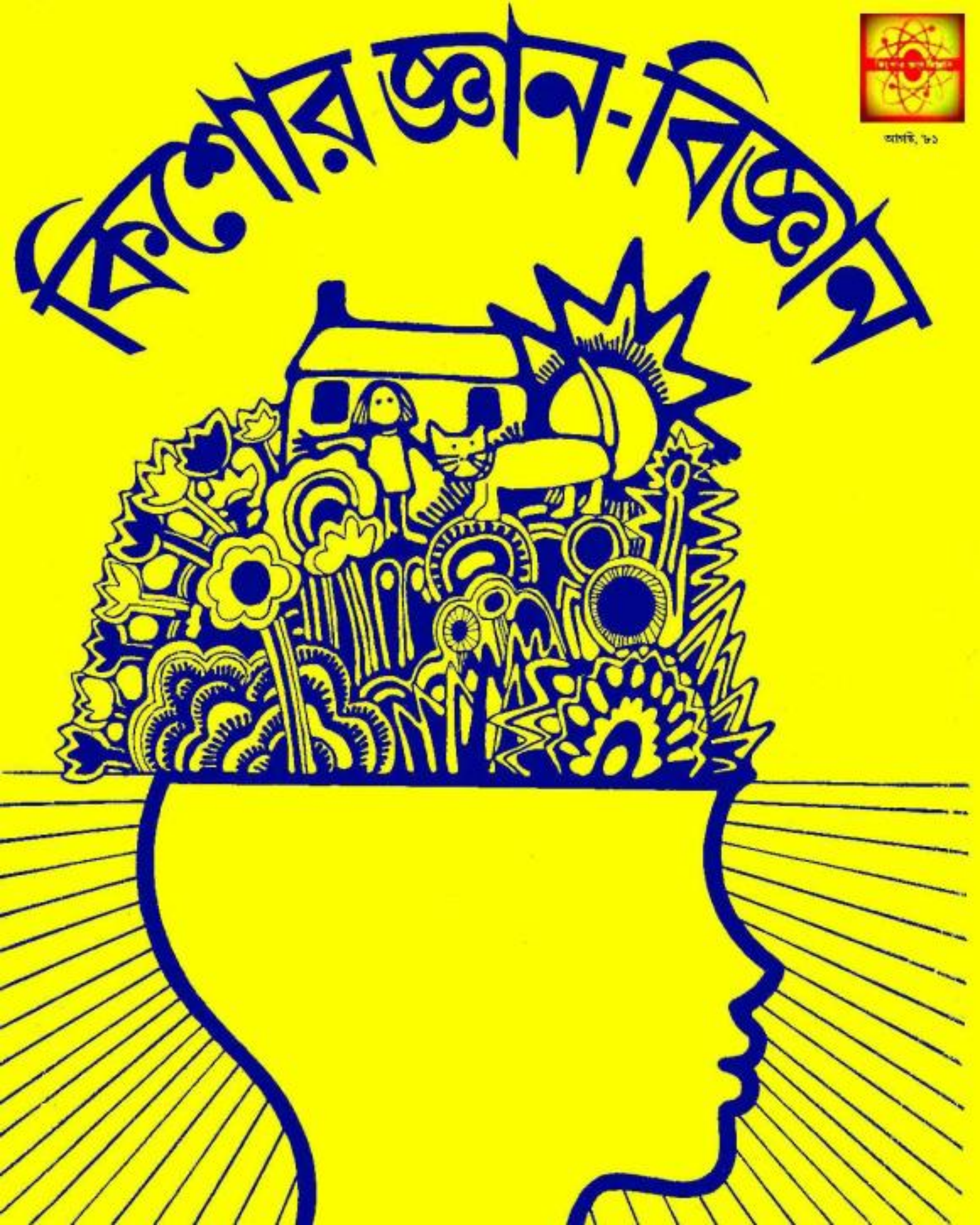

আগষ্ট, ৮১

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদার জুড়ি নেই	৫-০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা	৫-০০
ঘনাদা বিচিত্রা	১২-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদার অভিযান	১৫-০০
চারমূর্তি	৫-০০
ঝাউবাংলোর রহস্য	৫-০০
কম্বল নিরুদ্দেশ	৫-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত

বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	১০-০০
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন	৮-০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪-০০
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ	৪-০০
পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা	৪-০০

সমরজিৎ কর

ভয়ংকর সেই অভিযান	১৫-০০
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	১৫-০০

স্বপনবুড়ো

বুক অব নলেজ	১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত

আলো আরও আলো	১৫-০০
রোমাঞ্চকর রসায়ন	১২-০০

অমরনাথ রায়

সংখ্যা নিয়ে খেলা	৫-০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা	৫-০০

ছোটদের বই

বাঙালী রবিনহুডের কাহিনী

বাঙলার নবাবী আমল যখন শেষ, ইংরেজ কোম্পানীর আমল তখন শুরু। শাসনের মুঠি সবে কড়া হচ্ছে। বন-বাদাড় প্রচণ্ডই আছে। ভাল রাস্তাঘাটও হয়নি। পথিক পথ চলতে ভয় পায়। সেরেস্থের চোখে ঘুম নেই। কখন বুঝি হানা দেয়—'হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোঁজা জবা ফুল।' মুখে হা-রে-রে পিলে-চমকানো ডাক। তারাই বাঙলার ডাকাত। সেইসব কাহিনী জানা মানেই প্রাচীন বাঙলাকে জানা। এই বই লিখে যোগেন্দ্রনাথ হৈ চৈ ফেলেছিলেন। আবার সেই বই বেরুল।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলার ডাকাত চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড	৬-০০
মহিম ডাকাত	১০-০০

বিশু মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত দস্যুকাহিনী	৬-০০

জীবনচরিতমালা

দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনকথা। অপরূপ ভাষায় লিখেছেন প্রখ্যাত জীবনীকার মণি বাগচি।

ভূমিকা লিখেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

রাজা রামমোহন	৫-০০
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ	৫-০০
শরৎচন্দ্র	৫-০০
পরমাপ্রকৃতি সারদামণি	৫-০০
আলোকময়ী শ্রীমা	৬-০০
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ	৫-০০
জীবনীশতক	২৫-০০
সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ	১০-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ॥ আগস্ট ১৯৮১

স্চীপত্র ।।

সম্পাদকীয়
শুভেচ্ছাপত্র ঃ
দপ্তর থেকে
সেই মাকড়সা ধরা মানুষটি ঃ সমরজিৎ কর ৪
বিজ্ঞান বিচিত্রা ঃ অনীশ দেব ৭
উপন্যাস
শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার
ও মঙ্গলগ্রহ ঃ অদ্রীশ বর্ধন ৯
পড়াশোনা
রসায়নের সহজ পাঠ ঃ অমরনাথ রায় ১২

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনা

ছেলেবেলার গল্প ঃ ১৭ ॥ পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করবার ক্ষমতা ঃ ২১ ॥ শিকারী গাছের কথা ঃ ২২ ॥ পশুপক্ষীর আত্ম-গোপন কৌশল ঃ ২৬ ॥ অদৃশ্য জীবজগতের বিস্ময় ঃ ২৯ প্রাচীন যুগের অতিকায় ঘণ্টা ঃ ৩১ ॥ সত্য কথা বলানোর ওষুধ ঃ ৩২ ॥ সূচ ও আলপিন ৩৩ ॥ কীটপতঙ্গের লুকোচুরি ঃ ৩৬ ॥ হস্তলিপি ঃ ৪৮ ॥ সাপ ও বেজীর লড়াই ঃ ৪১ ॥ করে দেখ ঃ ৫২
[এই সংখ্যা প্রকাশে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন সুবীর ভট্টাচার্য ও গোপাল ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি]

ছবিতে গল্প
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ৫৬
অজানা মহাকাশে ১৫
জীবচনরিত
আমার বড়দা ঃ পঙ্কজবিহারী ভট্টাচার্য ৪৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্মরণসভা ঃ ৪৬
বিশেষ রচনা
গোপালচন্দ্রের জীবনে
দেবেন্দ্রমোহন বসু ঃ সুবীর ভট্টাচার্য ৫৪
গোপালচন্দ্রের রচনাপঞ্জী ঃ ৫০
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, ধাঁধা, ভেবে বল'র উত্তর ঃ

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর

সম্পাদক ঃ রবীন বল
সহ-সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত

সম্পাদকীয়

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন, সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু এটাই তাঁর সামগ্রিক পরিচয় নয়। তাঁর আর একটি বড় পরিচয় বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি একজন উৎসর্গীকৃত লেখক। প্রবাসী, উদয়ন, অলোকা, পথ, নবারুণ, নতুনপত্র আনন্দ-বাজার, যুগান্তর. শিশুসাথী, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ। প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। শুধু পশুপাখি-গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গের উপরেই নয়, ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে রচিত তাঁর বিস্ময়কর অনেক প্রবন্ধই আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। বর্তমান সংখ্যায় বিশিষ্ট, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিকগণের বিভিন্ন রচনার সংগে গোপালচন্দ্রের মৌলিক চিন্তাপ্রসূত একাধিক রচনা সংযোজিত হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি—এবং যে সব রচনা আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের কাছেই শুধু নয়, বিজ্ঞান-পিপাসু সববয়সের পাঠকের কাছেই পরম আগ্রহের বিষয়।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকছে পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা গোপালচন্দ্রের রচনা সমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন কি আগ্রহী পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় না ?

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে প্রেরিত শুভেচ্ছাপত্র

[বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের ৭৬তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও নাগরিকবৃন্দের সম্মিলিত উদ্যোগে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে বিজ্ঞানীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রেরিত শুভেচ্ছাপত্রের কয়েকটি এখানে প্রকাশিত হল। স.]

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য না হলেও আমি বহুকাল থেকে তাঁর লেখার বিশেষ অনুরাগী। বাংলার মত নববিবর্হিত ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় পাঠক সাধারণের পক্ষে একসঙ্গে সরস ও সারবান করে লেখবার জন্যে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। বিদেশী অগ্রসর সব ভাষায় গন্তব্য যেমনই হোক চলার রাস্তা প্রায় তৈরী হয়েই আছে। বাংলার মত ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখককে এগিয়ে চলার সঙ্গে পা ফেলার পথও তৈরী করে চলতে হয়। আমাদের দেশের বিরল কয়েকজন বিজ্ঞান-সাহিত্যের অগ্রপথিকের সঙ্গে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সেই কাজই করে এসেছেন। কৃতজ্ঞ দেশবাসীর কাছে এ সম্বর্ধনা বহু দিন আগেই প্রাপ্য ছিল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্তগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। একদা প্রবাসী ও বঙ্গশ্রী প্রভৃতি পত্রিকায় জীববিদ্যা বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আনন্দ ও উপকার পাইয়াছিলাম। গোপালবাবু বিজ্ঞানচিন্তা ততটা বই পড়ার পথে নয়, যতটা ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে। গোপালবাবু প্রবন্ধগুলি যদি ইংরাজীতে লিখিতেন তবে তাঁহার খ্যাতির সীমানা আরও প্রসারিত হইত। কিন্তু তাঁহার যে খ্যাতির ক্ষতিতে আমাদের লাভের বৃদ্ধি। গোপালবাবু জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীসুকুমার সেন

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংবর্ধনার যে আয়োজন করা হইয়াছে, তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত। আমি বহু বৎসর হইতে গোপালবাবুকে জানি। তিনি একজন নীরব কর্মী; ভৌতিক বিজ্ঞানের (যাহাকে ইংরেজিতে বলে Physical Sciences—Human Sciences অর্থাৎ মানবিকী বিদ্যার বাহিরে যাহা, তাহার) চর্চায় তিনি আত্মনিয়োজিত হইয়া অতন্দ্রভাবে অদ্ভুত অধ্যবসায় ও অভিনিবেশের সহিত অনুসন্ধান-কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অতি সহজ সাবলীল সুবোধ্য ও সুপাঠ্য ভাষায় তিনি বিজ্ঞানের তথ্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য পরিবেষণ করিয়া আসিতেছেন। এই অসাধারণ গবেষণা-প্রবৃত্তি, তথ্যানুসন্ধিৎসা এবং জিজ্ঞাসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা—যে নিষ্ঠা কোনও সম্মান বা আর্থিক ফললাভের প্রত্যাশী নহে—তাহা বাস্তবিকই সুদুর্লভ। এক পুরুষ ধরিয়া তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, এবং দেশের লোকের সত্যকার প্রীতি ও শ্রদ্ধা অতি সহজভাবেই তাঁহার কণ্ঠদেশে জয়মাল্য অর্পণ করিয়াছে। বঙ্গভাষী প্রত্যেক বিজ্ঞান-সাধক গোপালবাবুর বৈজ্ঞানিক আলোচনার কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিনয়-নম্র সৌজন্য-মণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র্য-মাধুর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট। এই শুভ অবসরে আমিও আমার অকুণ্ঠ প্রশংসা, শ্রদ্ধা এবং সৌহার্দ্য তাঁহার উদ্দেশে জ্ঞাপন করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি।

ইতি—

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক শ্রীযুক্তগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনে আপনারা উদ্যোগী হয়েছেন জেনে খুশি হলাম। গোপালবাবু নিজে জীববিজ্ঞানী, নানা গবেষণায় রত, তবু তারই মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ রচনা করে বঙ্গভাষী সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শ্রীঅশোককুমার সরকার

জীব-বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেছেন জেনে সুখী হলাম। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে তিনি ৩ দশক নিরলস সেবা করে এই প্রতিষ্ঠানকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় আমরা বার বার পেয়েছি। শ্রীভট্টাচার্যের মত নিরলস কর্মী আমাদের দেশে বিরল।

ইতি—

সত্যেন্দ্রনাথ সেন

বিজ্ঞানী এবং বাংলা ভাষায় বিশিষ্ট এবং অগ্রজপ্রতিম বিজ্ঞান-লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের যথোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে আপনারা যে উদ্‌যোগী হয়েছেন এতে ব্যক্তিগতভাবে আমি আনন্দিত হয়েছি। প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসেবে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের অবদান ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। তাঁর মাকড়সা এবং বিশেষ শ্রেণীর কয়েকটি কীট-পতঙ্গের ব্যবহারিক চরিত্র শারীরবৃত্তীয় ধর্মাবলীর উপর গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী শুধু ভারতেই নয় বিদেশের জ্ঞানীগুণী মহলেও একসময় যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল বলে আমরা জানি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, 'দেশ' পত্রিকার অফিস যখন বর্মন স্ট্রীটে, তখন প্রায়ই তিনি সেখানে আসতেন এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। এ ছাড়াও তিনি নিজে সে যুগে 'দেশ'-এর সাধারণ সংখ্যায় এবং পূজা সংখ্যায় জীব-বিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ লিখে আমাদের সহায়তাও করেছেন। তখন আমাদের সামর্থ ছিল অকিঞ্চিৎকর এবং পুঁজি প্রায় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু গোপালবাবুর সক্রিয় সহযোগিতা থেকে আমরা কখনো বঞ্চিত হই নি।

বিশিষ্ট এই বিজ্ঞান তপস্বীর সম্বর্ধনার জন্য আপনার যে আয়োজন করেছেন, সে ব্যাপারে আমার সক্রিয় সমর্থন রইল।

এই সঙ্গে বিজ্ঞান-তপস্বীর উদ্দেশ্যে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

সাগরময় ঘোষ

আপনারা শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে সম্বর্ধনা নিবেদন করেছেন জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত আমার তেমন পরিচয় নাই। কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি প্রথম যৌবন হইতে পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা বিজ্ঞানী নহেন কিন্তু তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানী। যে কয়েকটি গুণ থাকিলে বিজ্ঞানের রহস্যময় জগতে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে সে গুণগুলি গোপালবাবুর আছে। তিনি কৌতূহলী, তিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনি অধ্যবসায়ী, তিনি অনন্যমনা। তাঁহার নিরলস কর্মময় জীবন বিজ্ঞানের সেবাতেই উৎসর্গীকৃত। এই জ্ঞান-তপস্বীকে আমার প্রণাম জানাই।

বনফুল

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনার সঙ্গে আমি ছোটবেলা থেকেই পরিচিত। স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়ের পর তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি সরল বাংলায় বিজ্ঞান-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লিখে বাংলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই। বিজ্ঞানচেতনা উন্মেষের জন্য গোপালবাবুর নিষ্ঠা ও পরিশ্রম বিফলে যায় নি। আজ বাঙ্গালীরা বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন।

অমিতাভ চৌধুরী

পৃথিবীর মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন যে, সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হল নিজেকে জানা। কিন্তু সেই আমাকে ঘিরে দশ দিক্ প্রসারিত নিসর্গের লীলা ও প্রাণের বিকাশ, তার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে, আপনাকেও সম্যক বোঝা সম্ভব হয় না। তাই জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে প্রকৃতির স্থান অনেক উঁচুতে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের বিদ্যালয়ে জীব-বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও, বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের দিকে ছেলেমেয়েদের চোখ ফুটিয়ে দেবার খুব বেশী চেষ্টা হয় না। শিক্ষকমহাশয়রা মামুলী তথ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। প্রাণী-তথ্যের পিছনে যে প্রাণতত্ত্ব কাজ করে, তার খবর রাখে দু-একজনা। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম মনে পড়ে। তাঁকে আমরা অভিনন্দন করি।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এই অনির্বাণ মশাল আমাদের সন্তানদের হাতে দিয়েছেন। দেশের সব শিশু-প্রেমিকদের প্রতিনিধি হয়ে তাঁকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাই।

লীলা মজুমদার

সেই মাকড়সা ধরা মানুষটি

সমরজিৎ কর

লোকে বলে না, মাকড়সার জালে একবার পড়লে আর রক্ষে নেই ?

আমার কথা শুনে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এক্ষুনি হয়ত চেঁচিয়ে উঠে বলবে, তা আর জানি না ? আমাদের ঘরেই তো দেখি কত মাকড়সা। ঘরের কোণে ঠিক ছাদের কাছ বরাবর ফিনফিনে পাতলা জাল তৈরি করে তার মাঝখানে কেমন ঘাপটি মেরে বসে থাকে। মনে হয় কতই না শান্ত। কিন্তু যেই সেই জালে গিয়ে পড়ল একটি মাছি বা অন্য কোন কীট, তখন মজা দেখে কে ? শান্ত হয়ে গুঁটি গুঁটি বসে থাকা সেই মাকড়সা সেই জালে মাছিটিকে মুহূর্তে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলল। ছুটে এসে নিজের শরীর থেকে বিষ ঢেলে তাকে পঙ্গু করে ফেলল। তারপর ভক্ষণ।

ঠিক কথা। কিন্তু যে মানুষটির কথা বলছি, তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনলে তোমরা আরও অবাক হবে। তোমাদের অভিজ্ঞতা তার কাছে নস্যি।

তা বছর বিয়াল্লিশ হবে। কলকাতার পাশে এখন যে জায়গাটিকে বলা হচ্ছে লবন হ্রদ, তখন তার পাশেই ছিল ছোট্ট একটি গ্রাম। নাম কেষ্টপুর। একদিন সন্ধের দিকে তিনি সেই গ্রামের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। এমন সময় এক কুঁড়ে ঘরের পাশ থেকে শুনতে পেলেন এক রাখাল বালকের চীৎকার। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ঢুকলেন কুঁড়ে ঘরে।

কিন্তু সেখানে ঢুকেই তো তাঁর চক্ষু চড়ক গাছ। ঘরের মধ্যে একটি বিরাট মাকড়সার জাল। সেই জালে বাঁধা পড়েছে জলজ্যান্ত একটি চামচিকে। আর তার ঘাড়ের উপর কামড়ে রয়েছে রাক্ষসের মত একটি মাকড়সা। চামচিকেটির কী সে আর্তনাদ। অনেক কষ্টে যদিও সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল, মাকড়সাটির হাত থেকে রেহাই পেল না। চামচিকেটির পিঠের উপর বসে সে কামড়ে ধরে রইল।

ভদ্রলোক ওই অবস্থায় মাকড়সা এবং চামচিকেটি ধরে নিয়ে এলেন তাঁর গবেষণাগারে। এখন যাকে তোমরা বসু বিজ্ঞান মন্দির বলে জান, সেখানেই গবেষণা করতেন তিনি। গবেষণাগারে নিয়ে এসে ওদের তিনি একটি কাচের জারে রেখে দিলেন সারা রাত। পরদিন ভোরে দেখলেন চামচিকেটি মরে জারের এক কোণে পড়ে রয়েছে। আর সেই মাকড়সাটি ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে

প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আর এক পাশে। সারা রাত সে শিকারকে স্পর্শও করে নি।

বলতে কী, এইভাবে তিনি একটি আবিষ্কারই করে ফেললেন। এর আগে অনেকেই জানতেন, মাকড়সারা প্রাণীভোজী। এবং সেই সব প্রাণীর বেশির ভাগই দুর্বল। তাদের কোন মেরুদণ্ড নেই। অবশ্য কোন কোন জাতের মাকড়সা মাছ, ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি এই ধরনের কিছু কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণীও শিকার করে। তবে চামচিকেও যে তারা শিকার করে এই প্রথম তা জানা গেল। আর তা জানিয়েছেন সেই মানুষটি, এ বছর ৮ই এপ্রিল যাঁর মৃত্যু হল। নাম গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

কত রকম মাকড়সা নিয়েই না তিনি গবেষণা করেছেন। কোন কোন মাকড়সা গর্তে বাস করে। যতদূর সম্ভব দিনের আলোয় তারা গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে

আসতে চায় না। এক শ্রেণীর মাকড়সা আছে, যাদের তিনি নাম দিয়েছেন 'তাঁতী-বৌ মাকড়সা'। গাছে গাছে জাল তৈরি করে সেখানে তারা বাস করে। কোন কোন শ্রেণীর মাকড়সা সুড়ঙ্গের সামনে জালের ফাঁদ পেতে শিকার করে। ফড়িং এবং তার চেয়েও বড় পতঙ্গ ধরে অপূর্ব কৌশলে।

একবার হলো কি—সেটা ১৯৩১ সালের মার্চ মাসের ঘটনা—মাকড়সার সন্ধান করতে গিয়ে গোপালচন্দ্র এক জলাশয়ে দেখলেন অদ্ভুত এক ঘটনা। জলাশয়টি ছিল শালুক পাতায় ভরতি। একটি পাতার উপর দেখলেন দুটি মাকড়সা। একটি অপরটির গায়ে তীক্ষ্ণ দাঁত ফুটিয়ে তাকে অসাড় করে ধীরে ধীরে তার দেহের রস চুষে খাচ্ছে। আস্তে আস্তে তিনি এগিয়ে গিয়ে শিকারী মাকড়সাটিকে ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাড়া পেয়েই সে চম্পট। তার পিছু পিছু ধাওয়া করলেন তিনি। হঠাৎ দেখা গেলো জলাশয়টির জলে হাত-পা গুটিয়ে সে ভাসছে। দেখে মনে হল প্রচুর ছোটাছুটি করে মারাই গেছে ব্যাচারা। কিন্তু যেই তিনি হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন, ও মা! হঠাৎ অদৃশ্য! ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়েছিলেন গোপালচন্দ্র। পরে অনুসন্ধান করে জানলেন, ওই মাকড়সারা ভারী চালাক। ওরা ব্যাঙের মত জলেও বাস করতে পারে, আবার ডাঙায়ও বাস করতে পারে। মানে উভচর। গোপালচন্দ্র বুঝতে পারলেন, জলাশয়ের মাকড়সাটি সেদিন তাঁকে দেখে জলের ভেতর ডুব দিয়েছিল। তিনি দেখেছেন, ডুবুরী মাকড়সারা জলের নীচে দশ-পনের মিনিট পর্যন্ত অনায়াসে ডুব দিয়ে থাকতে পারে।

ছোট ছোট তেচোখা মাছ ধরে মাকড়সা। অনেক মাকড়সা দেখতে আবার পিঁপড়ের মত। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার চোরও হয়। দেখেছ নিশ্চয়, অনেক সময় মুখের ডগায় সাদা ডিম নিয়ে কখনও কখনও পিঁপড়ের দল কেমন চলাফেরা করে। এই হল সুযোগ। পিঁপড়ের মত দেখতে ওই মাকড়সারা তখন ঘুর ঘুর করে তাদের পাশে। আর সুযোগ পেলেই হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে পিঁপড়ের মুখ থেকে ডিম কেড়ে নিয়ে চম্পট।

বাংলাদেশের বহু মাকড়সাই আবিষ্কার করেছেন গোপালচন্দ্র। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃতির এই অদ্ভুত প্রাণী আমাদের বন্ধুরও কাজ করে। নানারকম মাছি এবং পোকামাকড় খেয়ে ফেলে আমাদের উপকারই করে।

না, শুধু মাকড়সাই নয়। প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকতেন গোপালচন্দ্র। পিঁপড়ের পেছনে ছুটে দেখতেন তাদের জন্ম রহস্য, তাদের অপার বুদ্ধি, তাদের যুদ্ধ করার কায়দা। তোমাদের আশেপাশেই তো কত পিঁপড়ে চলা-ফেরা করে। খুদে খুদে এই প্রাণী কি ভাবে হাঁটে, চলার পথে সামনে কোন বাধা পড়লে কি ভাবে সেই বাধা অতিক্রম করে—একটু ধৈর্য ধরে দেখলে তোমরাও অবাক হবে। জানতে পারবে অনেক মজার ঘটনা। কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিঁপড়ের স্বভাব জানার জন্যে ব্যয় করেছেন গোপালচন্দ্র তার হিসেব দেওয়া শক্ত।

শুধু শহরই নয়। গ্রাম বাংলার পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, চাষের ক্ষেতে কত রকম পোকামাকড়। ফড়িং, প্রজাপতি, মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল, কুমোরে পোকা, গঙ্গপাল—আরও কত কী? তাদের বিবরণ, স্বভাব-চরিত্র, তারা কতটা আমাদের উপকার করে, কতটা ক্ষতি করে—তা জানার জন্যে যেভাবে তিনি পরীক্ষা করেছেন, ভারতে তার তুলনা মেলে না। তিনি ছেচল্লিশ রকম মাকড়সা আবিষ্কার করেছেন, যারা দেখতে পিঁপড়ের মত। ঠিকমত জানা না থাকলে বোঝাই যায় না, তারা পিঁপড়ে না মাকড়সা।

তোমরা তো নানা রকম ভিটামিনের নাম শুনেছ। খাবারে ভিটামিন না থাকলে সে খাবার খেয়ে শরীর পুষ্ট হয় না।

ভিটামিন নিয়ে লেগে পড়লেন গোপালচন্দ্র। মানুষ এক ধরনের প্রাণী। ব্যাঙাচিও তো প্রাণী? মানুষের উপর যদি ভিটামিনের প্রভাব থাকে, তাহলে ব্যাঙাচির উপরই বা থাকবে না কেন? পরীক্ষা করেই দেখা যাক। হ্যাঁ, ভিটামিন বি-১২ প্রয়োগ করলেন তিনি ব্যাঙাচির উপর। দারুণ ব্যাপার। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, এই ভিটামিন পেয়ে ব্যাঙাচিরা তড়িঘড়ি ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এ ধরনের ঘটনা ভারতে তিনিই প্রমাণ করলেন প্রথম। শুঁয়োপোকা নিয়েও কি কম পরীক্ষা করেছেন তিনি। কি ভাবে শুঁয়োপোকার জন্ম হয়, কি ভাবে তাদের রূপান্তর ঘটে, কি ভাবে তারা আত্মহত্যা করে—এসব ঘটনা নিয়ে ভারতে তিনিই প্রথম পরীক্ষা চালান। তাঁর এই গবেষণার কথা দেশ বিদেশে বিখ্যাত বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানী-মহলে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। অনেকে অবাক হন। সত্যিই তো, আমাদের আশে-পাশে এত যে জানার জিনিস আছে, কই, আগে তো বোঝা যায় নি?

প্রকৃতিকে দেখার অদ্ভুত চোখ ছিল গোপালচন্দ্রের। ছাত্র হিসাবে ছিলেন খুবই ভাল। কিন্তু সংসারের অনটনে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর কলেজে পড়ার আর তাঁর সুযোগ হল না। সংসার বাঁচাতে গিয়ে পরিশ্রম। ওদিকে সহজাত বিজ্ঞানী মন। এই দুই-এর মধ্যে কত টানা-পোড়েন। প্রচুর বাধা। তবু নীরব সাধকের মত আমাদের আশেপাশে চোখ রেখে কত রহস্যই না আবিষ্কার করেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর চোখে পড়েছিল তাঁর এই গুণটি। গুণীই তো গুণীকে বুঝতে পারেন। জগদীশচন্দ্র তাই তাঁকে ডেকে পাঠালেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। বললেন, তুমি বিজ্ঞানী। গবেষণা কর। কিন্তু বিজ্ঞানী হতে গেলে তো উঁচু ডিগ্রি চাই।

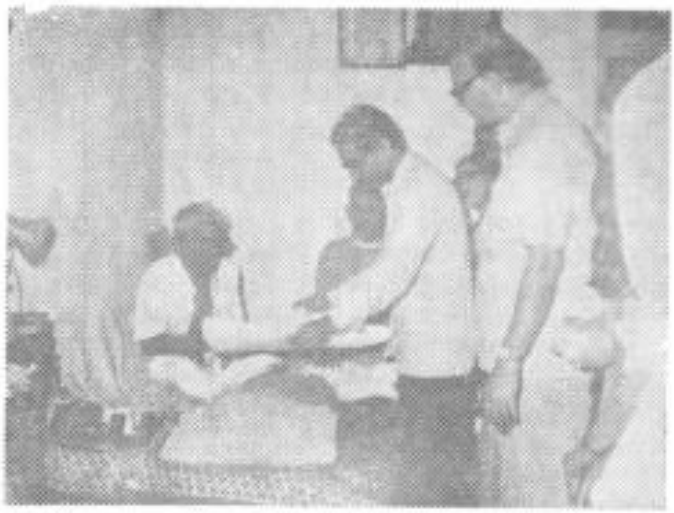

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সাম্মানিক ডি এস-সি উপাধি অর্পণ করছেন উপাচার্য ডঃ রমেন পোদ্দার
ফোটো—দেবব্রত মণ্ডল

বাজে কথা। তুমি এমনিতেই পারবে। বললেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর অনুপ্রেরণায় গবেষণার কাজে হাত দিলেন গোপালচন্দ্র। ১৯৮১ সালে তাঁর অসামান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টর অভ্ সায়েন্স উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

এখন প্রকৃতি বিজ্ঞানের কত কদর। তখন ছিল না। এখন অনেকেই তোমরা জেনে ফেলেছ, প্রকৃতি এক রহস্যময় জগৎ। গাছপালা তো আছেই। সেই সঙ্গে আছে কত কীটপতঙ্গ। কত জীবাণু। এদের কেউ আমাদের ক্ষতি করে, কেউ উপকার করে। কি ভাবে তা হয়, তা জানতে গেলে প্রাণীদের আচরণ এবং জীবনপ্রণালী জানা দরকার। এখন সে কথা আমরা বুঝতে শিখেছি! কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও এ নিয়ে ক'জন মাথা ঘামাত? সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বিজ্ঞানীরাও না। অথচ তখন নীরব সাধকের মত মনপ্রাণ দিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে গেছেন গোপালচন্দ্র। সেই সব পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে এখন কত রকম গবেষণাই না হচ্ছে। তোমাদের বলি, তাঁর লেখা 'বাংলার কীটপতঙ্গ' বইটি একবার পড়ো। সুন্দর বাংলা ভাষায় এই বইটির মধ্যে বিভিন্ন কীট-পতঙ্গের যে সব বিবরণ দেখবে, তারা যেন ডিটেক-টিভের গল্পকেও হার মানায়। বইটি পড়ার পর তোমাদেরও হয়ত মনে হবে, আগ্রহ থাকলে তোমরাও কত কিছু আবিষ্কার করতে পার।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের

নতুন বই

পশুপাখি-কীটপতঙ্গ

শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ থেকে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

অনীশ দেব

আইফেল টাওয়ার কতটা লম্বা ?

এই প্রশ্নটা তোমাদের কাছে রাখলে হয়তো তোমরা চটপট উত্তর দিয়ে দেবে, তিনশো মিটার।

কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্য চিন্তাভাবনা যদি কেউ করো, তাহলে বুঝতে পারবে, আমার প্রশ্ন শুনে তোমাদের পাল্টা প্রশ্ন করা উচিত ছিলো, 'কোন সময়ে ?' গরমকালে না শীতকালে ?

কারণ ঐ রকম প্রকাণ্ড একটা ইস্পাতের টাওয়ারের উচ্চতা তাপমাত্রার হেরফেরে নিশ্চয় বাড়বে-কমবে। এখন দেখা যাক, গরমকালে ও শীতকালে আইফেল টাওয়ারের উচ্চতায় কতোটা তফাং হতে পারে।

তোমরা হয়তো জানো ইস্পাতের 'দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক' ০.০০০০১১, অর্থাৎ, একটা ১০০ মিটার লম্বা ইস্পাতের রডকে গরম করে এক ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে রডের দৈর্ঘ্য ১.১ মিলিমিটার বেড়ে যাবে। তাহলে এক ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের তফাং হলে আইফেল টাওয়ারের উচ্চতার তফাং হয়ে যাবে ৩.৩ মিলিমিটার।

গরমকালে রোদ ঝকঝকে দিন হলে প্যারিসে তাপমাত্রা হয় মোটামুটি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড, আর আইফেল টাওয়ারের তাপমাত্রা তখন দাঁড়ায় চল্লিশ ডিগ্রী।

আবার শীতকালে খুব ঠাণ্ডা বৃষ্টির দিনে এই তাপমাত্রা নেমে আসে শূন্য ডিগ্রীতে। তাহলে গরমকালে ও শীতকালে টাওয়ারের তাপমাত্রার তফাং হয় মোটামুটি চল্লিশ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। অতএব উচ্চতার মোট তফাং হবে ৪০ × ৩.৩ = ১৩২ মিলিমিটার।

সত্যি সত্যি মেপে দেখা গেছে, আইফেল টাওয়ার তাপ সুবেদী হওয়ায় গরমকালে ও শীতকালে ছোট-বড় হয় ১৩২ মিলিমিটারেরও বেশী। নিকেল ও ইস্পাতের তৈরী সঙ্কর ধাতুর একটা সরু তার দিয়ে এই গরমিলের মাপ নেওয়া হয়েছে। তাপমাত্রার হেরফেরে ওই তারের দৈর্ঘ্যের কিন্তু খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। তার কারণ যে সঙ্কর ধাতু দিয়ে তারটা তৈরী হয়েছিল, তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক খুবই কম—মাত্র ০·০০০০০৯। সেই জন্যেই এই সঙ্কর ধাতুর পোশাকী নাম হলো 'ইনভার' অর্থাৎ, ইনভ্যারিয়েব্‌ল্‌ বা অপরিবর্তনীয় নয়।

আমাদের হাওড়া ব্রীজও গরমকালে ও শীতকালে ছোট-বড় হয়। ছোট-বড় হওয়ার সময় যাতে ব্রীজের কোন ক্ষতি না হয়, সেজন্য প্রযুক্তিবিদেরা তার গঠনে বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, বরফের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক কিন্তু অনেক বেশী—ইস্পাতের প্রায় পাঁচ গুণ। অর্থাৎ, আইফেল টাওয়ার যদি বরফের তৈরি হতো, তাহলে গরমে ও শীতে সেটা ছোট-বড় হতো ৬৬০ মিলিমিটার !

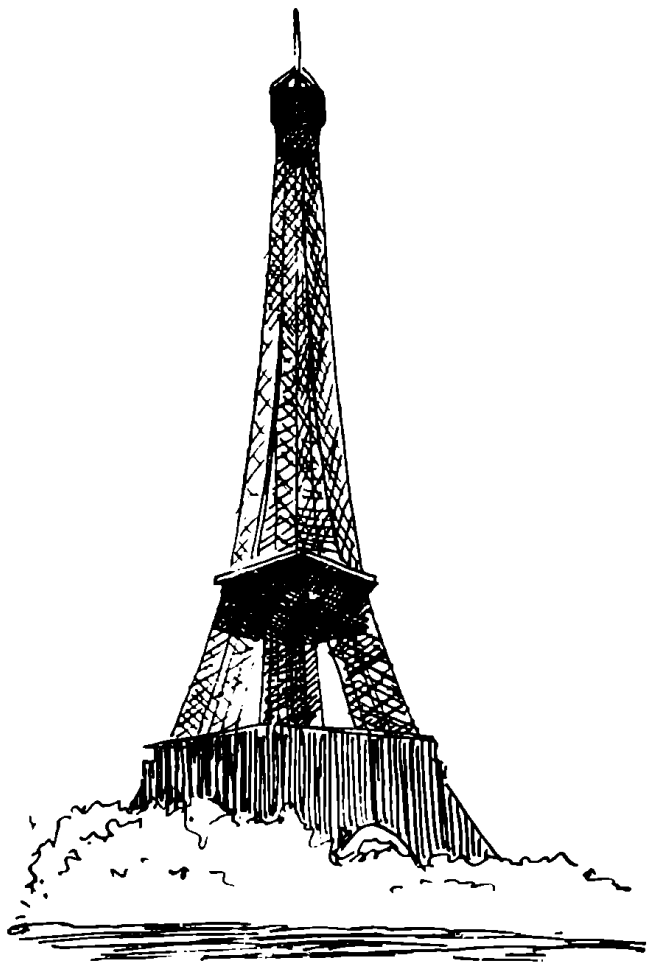

আইফেল টাওয়ার

সবার সেরা আলোর গতি

আলোর গতিবেগ কতো সেটা তোমাদের সকলেরই জানা আছে—সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুশো একাশি মাইল। এখন মনে করো, প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে এরকম একটা মোটরগাড়ি থেকে তোমার দিকে টর্চের আলো ফেলা হলো। এই আলো তোমার কাছে কি গতিবেগ নিয়ে পৌঁছাবে? নিশ্চয়ই আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগে। কারণ, সাধারণ হিসেবে মোটর গাড়ির গতিবেগ আলোর গতিবেগের সঙ্গে যোগ হবে। অর্থাৎ, গতিবেগ হবে, $V+C$. যেখানে V মোটরগাড়ির গতিবেগ, আর C হলো আলোর গতিবেগ।

হ্যাঁ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বেরোনোর আগে পর্যন্ত আমাদের এই বিশ্বাসই ছিল কিন্তু এখন তাঁর 'বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব' দিয়ে সেই ধারণা আমূল পালটে দিয়েছেন আইনস্টাইন। তিনি বলেছেন, আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ কোন বস্তুর হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, আলোর গতিই চূড়ান্ত। তাঁর এই তত্ত্ব বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিতও হয়েছে।

সুতরাং ওপরের উদাহরণ থেকে এক অদ্ভুত জিনিস পাওয়া যাচ্ছে।

$$V+C=C$$

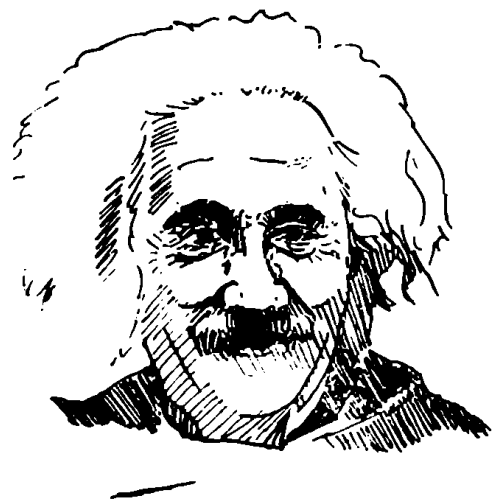

আইনস্টাইন

এই অঙ্কের গরমিল মেলাতে আইনস্টাইন দুটো বস্তুর গতিবেগ যোগ করার এক নতুন সূত্র দিলেন মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে। অর্থাৎ, মোটর গাড়ি ও আলোর গতিবেগের সম্মিলিত গতিবেগ বের করতে হবে অন্যভাবে, দুটো গতিবেগ যোগ করে নয়। আইনস্টাইনের নতুন সূত্র অনুযায়ী,

$$\text{সম্মিলিত গতিবেগ} = \frac{V+C}{1+\frac{V\times C}{C^2}}$$

অঙ্ক কষলে দেখা যাবে, এর উত্তর হবে,

সম্মিলিত গতিবেগ $= C$.

এবারে, ধরা যাক, কোন সাঁতারু V বেগে নদীর স্রোতের সঙ্গে একই দিকে সাঁতার কেটে চলেছে। যদি স্রোতের গতিবেগ v হয়, তাহলে, সাঁতারুর লব্ধ গতিবেগ কতো? $v+V$? মোটেই না!

এইরকম সাধারণ দুটো গতিবেগ V ও v যোগ করে সম্মিলিত গতিবেগ পেতে হলে, আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী,

$$\text{সম্মিলিত গতিবেগ} = \frac{V+v}{1+\frac{V\times v}{C^2}}$$

যেহেতু আলোর গতিবেগ, C, অন্য দুটো গতিবেগ, V ও v,-এর চেয়ে অনেক অনেক বড় সেহেতু $\frac{V\times v}{C^2}$ কে মোটামুটিভাবে শূন্য ধরা যায়। ফলে, সাঁতারুর গতিবেগ হচ্ছে আমাদের পুরোনো হিসেব মতো, $V+v$।

সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে যে সব গতিবেগ আমরা সচরাচর দেখি তাদের ক্ষেত্রে শুধু যোগ দিয়েই মিলিত গতিবেগ বের করা যায়। উত্তরে তেমন ভুল হবে না। কিন্তু, দুটো গতিবেগের একটা যদি আলোর গতিবেগের খুব কাছাকাছি হয়,, তাহলেই মুশকিল! শুধু যোগে আর তখন কাজ হবে না। আইনস্টাইনের সূত্রেরই সাহায্য আমাদের নিতেই হবে। সুতরাং, দুটো গতিবেগ যোগ করতে তোমরা এখন থেকেই সাবধান হও!

ধারাবাহিক উপন্যাস

শার্লক হোমস প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গলগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

আগে যা ঘটেছে

[অদ্ভুত এক কৃস্ট্যাল কিনেছেন শার্লক হোমস লণ্ডনের পুরানো শিল্পদ্রব্যের দোকান থেকে—যার মধ্যে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলের আশ্চর্য সব দৃশ্য। লাল পাহাড় নীল আকাশ, পাণ্ডুর বর্ণ সূর্য, ছাদ, আর দ্যুতিময় মাস্তুলশীর্ষ। আর বিচিত্র সব প্রাণী ঘোরাফেরা করছে সেই ছাদে। সরু সরু হাত—পা লম্বা শুঁড়। এ মাস্তুল থেকে অন্য মাস্তুলে উড়ে বেড়াচ্ছে ডানার সাহায্যে। ডানাটা যে নকল উড়বার যন্ত্র এ ব্যাপারে শার্লক হোমস আর চ্যালেঞ্জার একমত। এরা যেমন কৃস্ট্যালের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে ওদের দেখছে, মঙ্গলের প্রাণীরাও ড্যাব-ডেবে চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে—পৃথিবীর দিকে। কিন্তু এই কৃস্ট্যাল পৃথিবীতে কিভাবে এল? প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের অভিমত ১৮৯৪ সালে মঙ্গলগ্রহে যে বিপর্যয় দেখা যায়—তখনই এক বিশেষ শক্তির সাহায্যে কৃস্ট্যালদের পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল—পৃথিবীর উপরে নজর রাখতে। কিন্তু মঙ্গলগ্রহীদের উদ্দেশ্য কি? পৃথিবী আক্রমণ? এরপর দীর্ঘ কটি মাস চ্যালেঞ্জার কৃস্ট্যালের ওপর চোখ লাগিয়ে বসে রইলেন, আর হোমস ব্যস্ত রইলেন চোর-ডাকাত-খুনে-গুণ্ডাদের রহস্য নিয়ে।

তারপর হঠাৎই একদিন শুরু হল—মঙ্গলগ্রহে অগ্ন্যুৎপাত। মুহুর্মুহু অগ্নিবর্ষণ শুরু হল মঙ্গলগ্রহে। এ দৃশ্য দেখা গেল—পৃথিবীর সব মানমন্দিরে; কৃস্ট্যালের ভেতরেও। অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখলেন শার্লক হোমস ও চ্যালেঞ্জার। তবে কি ওরা সত্যিই পৃথিবীকে আক্রমণ করতে চায়?]

[ছয়]

নীল বিদ্যুৎ

২২শে মে'র পর থেকে অগ্নিঝলক আর দেখা গেল না মঙ্গলের বুকে। কিন্তু ৬ই জুন একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোলো হোমসের নামে। পাঠাচ্ছে বৈদেশিক দপ্তর থেকে স্যার পার্সি ফেল্পস।

"আজ সকালে ওকিংয়ের কাছে একটা বিরাট চোঙা পড়েছে। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, ভেতরে জীবন্ত প্রাণী রয়েছে। আজ সন্ধ্যায় চলো আমার সঙ্গে। সাহায্য দরকার।"

টেলিগ্রাম পেয়েই সটান চ্যালেঞ্জারের বাড়ী গেল হোমস্। প্রফেসর বাড়ী নেই—ওকিং গেছেন।

সঙ্গে নাগাদ স্যার পার্সির সঙ্গে ওকিং-গামী ট্রেনে চেপে বসল শার্লক হোমস্।

ওকিং শহর আর হরসেল এবং ওটারশ গ্রামের মাঝখানে বিরাট একটা তেপান্তরের মাঠ আছে। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে এই মাঠের মধ্যিখানে একটা মস্ত গর্ত দেখা দিয়েছে রাতারাতি। আকাশ থেকে জ্বলন্ত গোলা এসে পড়েছে নাকি সেইখানে।

গাঁয়ের লোক এবং শহরের লোক ছুটে এসেছিল রগড় দেখতে। জ্বলন্ত গোলা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল একটা অতিকায় চোঙা। চোঙার ডালাও নাকি একসময়ে খুলে গিয়েছিল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এবং আবির্ভূত হয়েছিল মাকড়শা অথবা অক্টোপাসের মত বিদঘুটেদেহী জীবেরা।

কাতারে কাতারে লোক সারাদিন দাঁড়িয়ে গর্ত ঘিরে। বিরাট গর্ত। চারপাশে মাটি উঁচু হয়ে গিয়েছে বাঁধের মত। পাড়ে দাঁড়িয়ে হুজুগে মানুষরা উৎসুক চোখে দেখছে অদ্ভুত ধাতু দিয়ে তৈরী আশ্চর্য সিলিণ্ডারটাকে।

তখন সন্ধে নামছে। সূর্য ডুব দিয়েছে।

হন্তদন্ত হয়ে স্যার পার্সির সঙ্গে শার্লক হোমস্ এসে পৌঁছোলো অকুস্থলে। স্যার পার্সিকে দেখেই এগিয়ে এল স্থানীয় মানমন্দিরের এক জ্যোতির্বিদ—ওগিলভি।

বললে—"প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এসেছিলেন।"

শান্ত কণ্ঠে হোমস্ বললে—"তারপর?"

"স্টেণ্টের সঙ্গে একচোট হয়ে গেল। সায়েণ্টিস্ট স্টেণ্ট—ঐ দেখুন ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। চ্যালেঞ্জার আবোল তাবোল কথা বলতে গিয়েছিলেন—হালে পানি না পেয়ে রেগেমেগে চলে গেলেন!"

"কী কথা?"

"সিলিণ্ডারটা নাকি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে। ভেতরকার ঐ অক্টোপাসের মত প্রাণীরা মঙ্গলগ্রহের জীব। ওদের কাছাকাছি না যাওয়াই এখন মঙ্গল।"

"আপনি দেখেছেন অক্টোপাসদের?"

"গাঁয়ের লোকেরা দেখেছে। কেউ বলে বিরাট মাকড়শার মত। বুড়ো বয়েসে প্রফেসরের ভীমরতি হয়েছে। পোকামাকড় কখনো সিলিণ্ডারে চড়ে মঙ্গলগ্রহ থেকে আসতে পারে? কি বলেন?"

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হোম্‌স্ বললে—"স্টেণ্ট ওখানে কি করছেন?"

ওগিলভি বললে—"ঐ যে ক্যামেরা হাতে ভদ্রলোককে দেখছেন, উনি খবরের কাগজের লোক। চোঙার প্রাণীদের কাছে আমরা এখন একটা প্রতিনিধির দল পাঠাবো। নেতৃত্ব দেবেন স্টেণ্ট, সঙ্গে থাকবেন রিপোর্টার। আমিও যাচ্ছি। স্যার পার্সি, চলুন আপনিও বৈদেশিক দপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে।"

খপ করে স্যার পার্সির কাঁধ চেপে ধরে শার্লক হোম্‌স্ বিনয়ক্ষরিত কণ্ঠে—"আজ্ঞে না। বৈদেশিক দপ্তরের ব্যাপার এটা নয়। বৈজ্ঞানিকদের ইচ্ছে হয় আবিষ্কারের নেশায় ছুটে যেতে পারেন—তবে আমার কথা যদি শোনেন—তাহলে পৃথিবীর বাইরে থেকে যারা এসেছে, তাদের মতলব আঁচ না করা পর্যন্ত, প্রতিনিধি পাঠাতে যাবেন না—কথাবার্তার চেষ্টা করবেন না।"

হোমসের দীর্ঘ শীর্ণ বপুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায় ওগিলভি বললে—"মহাশয়ের নাম জানতে পারি?"

জবাবটা দিল স্যার পার্সি—"শার্লক হোম্‌স্।"

চোখ কপালে উঠে গেল ওগিলভির—"শার্লক হোম্‌স্! নৌদপ্তরের দলিল নিয়ে এ-অঞ্চলে আপনিই তো এসেছিলেন ১৮৮৮ সালে!"

"এগজ্যাক্টলি!" নীরস কণ্ঠ হোমসের।

কপাল থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে ওগিলভি বললে—"আপনার মত সাহসী পুরুষ আমাদের সঙ্গে থাকলে খুশিই হতাম।—চলি, ওঁরা ডাকছেন।"

একরকম ছুটেই রক্তিমমুখ স্টেণ্টের দিকে চলে গেল ওগিলভি। শেষ কথাটায় শার্লক হোমসের সাহসের প্রতি কটাক্ষ কিন্তু হোম্‌স্‌কে স্পর্শও করল না। সে চেয়ে রইল স্টেণ্টের দিকে ঈষৎ উদ্বিগ্ন চোখে।

স্টেণ্টের হাতে একটা লাঠির ডগায় সাদা পতাকা। দু'পাশে ক্যামেরা হাতে খবরের কাগজের রিপোর্টার এবং ওগিলভি। তিনজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সিলিণ্ডারের আরো কাছে। স্টেণ্ট নাড়ছে শ্বেত পতাকা।

স্যার পার্সি বললে—"এতেই কাজ হবে। আমাদের বন্ধুত্বের নিশানা ঠিক বুঝবে ভিন্‌গ্রহের আগন্তুকরা।"

হোম্‌স্ বললে—"অন্য গ্রহ থেকে যারা এসেছে, তারা এ-গ্রহের রীতিনীতির কি জানে? সাদা পতাকার অন্য মানেও তো করতে পারে?"

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল লম্বা রডের ওপর একটা আয়নার মত বস্তু আস্তে আস্তে ঘুরে গেল আগুয়ান প্রতিনিধিদলের দিকে। গোধূলির ম্লান আভায় রডের শীর্ষদেশে দুলন্ত আয়নাসদৃশ বস্তুটাকে এতক্ষণ দেখতে পায় নি হোম্‌স্। এইবার স্পষ্ট দেখা গেল। চোঙার ভেতর থেকে লম্বা রডের ডগায় থিরথির করে কাঁপছে অনেকটা ফণাতোলা কেউটের মত অদ্ভুত আয়না।

আচম্বিতে আরও একটা জিনিস উঠে এল নীচ থেকে। গোখরোর চ্যাটালো ফণার মত একটা ঢাকনি দেওয়া বস্তু। অনেকগুলি সন্ধিযুক্ত একটা ধাতব হাত উঠিয়ে নিয়ে এল গোখরোর ফণাকে। আঁকাবাঁকা বহু সন্ধিযুক্ত ধাতুর হাত বিচিত্র ফণাটাকে যেন তাগ করে ধরল আগুয়ান প্রতিনিধিদলের দিকে। পাশেই স্থির হয়ে রইল আয়নার মত জিনিসটা। দুটো বস্তুই উদ্যত এগিয়ে-আসা তিন মূর্তির দিকে।

পতাকা নাড়তে নাড়তে আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল তিন মূর্তি।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শার্লক হোম্‌স্। দৃষ্টি নির্নিমেষ।

অকস্মাৎ একতাল সবুজ বাষ্প ভক্ করে উঠে এল নীচ থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ধাঁধানো নীল বিদ্যুৎ ছুটে গেল গোখরোর ফণার মত অদ্ভুত দর্শন জিনিসটার মধ্যে থেকে—সোজা প্রতিনিধিদলের দিকে। নীল বিদ্যুৎ মিলিয়ে গেল পর মুহূর্তেই—বাতাস যেন গুঙিয়ে উঠল তীব্র কাতরানিতে—লক্ষ ভোমরা যেন গুনগুনিয়ে উঠল রক্তহিম করা গজরানিতে সিলিণ্ডারের দিকে।

ভয়াবহ কাণ্ডটা ঘটল একই সঙ্গে। নীল বিদ্যুৎ প্রায় অদৃশ্য আকারে তিন মূর্তির দিকে ধেয়ে যেতেই সহসা নীল আগুনে আপাদমস্তক ঢেকে গেল তিনমূর্তির। বিকট আতসবাজীর মতই নিমেষে দাউ দাউ করে নীল আগুনে জ্বলে উঠেই তিনটে অঙ্গার দেহ আছড়ে পড়ল পেছন দিকে কালো পোড়া তিনটে ধূমায়িত দেহবিশেষ। দেহ বলে তাদের আর চেনাও যায় না।

বিষম হট্টগোল শোনা গেল পাড়ে দণ্ডায়মান জনতার দিক থেকে। আতংকে দিশেহারা হয়ে ছুটল তারা মাঠের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই নীল বিদ্যুৎ আবার ধেয়ে গেল সেইদিকে. আবার গজরে উঠল লক্ষ ভোমরা, আবার অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হল পলায়মান জনতা। জ্বলতে জ্বলতে আছড়ে পড়ল মাঠের ওপর।

অস্ফুট কণ্ঠে চীৎকার করে উঠে স্যার পার্সি যেই পেছন ফিরে ছুটতে গেছে, অমনি সাঁড়াশির মত আঙুলে শার্লক হোম্‌স্‌ তার কাঁধ খামচে ধরে এক হ্যাঁচকায় শুইয়ে দিল পাড়ের আড়ালে—মাটির ওপর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভোমরা গর্জনে বাতাস ফালাফালা করে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল নীল বিদ্যুৎ—দূরে পলায়মান মানুষগুলো জ্বলে উঠল নীল বাজির মত—আরও দূরে মাইল দুয়েক তফাতে গ্রামের ঘরবাড়িতে আগুন ধরে গেল চক্ষের নিমেষে—দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল গাছগুলো পর্যন্ত।

চারদিকের আর্তনাদ আর ভোমরা গর্জনের মধ্যে বিহ্বল কণ্ঠে স্যার পার্সি বললে—"হোম্‌স্‌! হোম্‌স্‌! এখানেই শুয়ে থাকবে?"

"না!" মাটিতে বুক চেপে শুয়ে থেকে হোম্‌স্‌ বললে—"ওদের যন্ত্রদৃষ্টিতে ধরা না দিয়ে পালাতে হবে। ঐ যে খালটা দেখছো, ওর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাই—দেখতে পাবে না।"

তখন আকাশে তারা ফুটছে। লেলিহান আগুন দেখা দিচ্ছে দিকে দিকে। মাথার ওপর দিয়ে তখনও ছুটে যাচ্ছে নীল বিদ্যুৎ। তীক্ষ্ণ শব্দে বাতাস ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে।

দুই বন্ধু প্রাণ হাতে করে কেঁচোর মত মাটি দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে পড়ল সরু খালে। এগিয়ে গেল ঐ ভাবেই আরও দূরে। জ্বলন্ত গাছপালার ফাঁক দিয়ে উঠল রাস্তায়। দৌড়ে ফিরে এল ওকিং গ্রামে।

সটান উঠল স্যার পার্সির বাড়িতে। হাঁপাতে হাঁপাতে স্যার পার্সি বললে—"হোম্‌স্‌, আজ তুমি না থাকলে—।"

"যা দেখলে, ওটা কিন্তু ছোট অস্ত্রের ভেল্‌কি।"

"আরো বড় অস্ত্র আছে?"

"নিশ্চয় আছে। এমন অস্ত্র যা প্রয়োগ করলে ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে থেকেও পার পাওয়া যাবে না।"

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

আষাঢ় সংখ্যার সমাধান

১। মানুষের দেহে ২৩জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোসোম আছে।
২। কাঠঠোকরা পাখির জিভ কণ্টকময়।
৩। হিলিয়াম মৌলের স্ফুটনাঙ্ক সর্বাপেক্ষা কম(−269°C)
৪। লিথিয়াম ধাতু সর্বাপেক্ষা হাল্কা।
৫। ভিটামিন-সি।
৬। কিউপ্রাস ক্লোরাইড।
৭। জোন্‌স জ্যাকব বার্জেলিয়াস।
৮। কার্বন
৯। চাঁদের গ্রীক নাম Selene; তার থেকে 34 নম্বর মৌলের নাম রাখা হয়েছে Selenium.
১০। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ মাপা হয় ফের্মি এককে (10^{-13} cm.)
১১। ডপলার এফেক্ট আবিষ্কৃত হয় 1842 সালে।
১২। প্রাণিবিজ্ঞানের ভাষায় দর্জি-পাখির (Tailor bird) নাম হলো ORTHOTOMUS SUTORIUS.

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

ধাঁধার উত্তর: ঘড়ির সংখ্যার এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ৭টি আঘাত করার পর, অষ্টম আঘাত বারোর ঘরে করে ক্রমান্বয়ে পর পর বামদিকের সংখ্যা-গুলোর উপর (১১, ১০, ৯.....) আঘাত করে যেতে হবে। যে সংখ্যার উপর আঘাত করার ফলে, কুড়ি গোনা শেষ হবে, সেটাই হল মনে করা সংখ্যা।

গত সংখ্যার 'ভেবে বল'র উত্তর

(১) (ক) বাজপাখি, (খ) রাজহাঁস, (গ) 'সুইফট', (ঘ) হামিংবার্ড (ক্ষুদ্রপাখি)
(২) এক প্রকার বৃহত্তর জাতীয় হরিণ, জটাযুক্ত শিং আছে।
(৩) এক প্রকার স্কটল্যাণ্ডদেশীয় মেষ-রক্ষক কুকুর।
(৪) স্পঞ্জ (Sponge)।
(৫) ডেভিড বুশ্‌নেল।
(৬) লম্বা লম্বা পা ফেলে।
(৭) জন্‌ ইয়ং।
(৮) এক প্রকার গ্যাসীয় সংমিশ্রণ, হাইড্রোজেন ও ফসফরাসের মৌলের সংযোগের ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর নাম ফস্‌ফিন্‌ (Phosphin)।

রসায়নের সহজপাঠ

অমরনাথ রায়

প্রতিটি অজৈব লবণ গঠিত হয় ক্ষার বা ক্ষারক এবং অ্যাসিডের সংযোগে। সেই কারণে প্রতিটি অজৈব লবণের দু'টি করে অংশ থাকে। একটি হলো ক্ষারকীয় অর্থাৎ ধাতব অংশ বা মূলক। অপরটি লবণের আম্লিক অংশ বা মূলক। প্রথমটিকে বলা হয় ক্ষারকীয় মূলক (basic radical) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় অ্যাসিডীয় বা আম্লিক মূলক (acid radical)। নীচের উদাহরণ-গুলি পর্যালোচনা করলে এই দুই শ্রেণীর মূলক সম্পর্কিত ধারণাটা স্পষ্টতর হবে।

কয়েকটি ধাতব লবণ	লবণে ক্ষারকীয় মূলক	লবণে আম্লিক মূলক
1. সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl	Na (সোডিয়াম)	Cl (ক্লোরাইড)
2. পটাসিয়াম নাইট্রেট KNO_3	K (পটাসিয়াম)	NO_3 (নাইট্রেট)
3. ক্যালসিয়াম কার্বনেট $CaCO_3$	Ca (ক্যালসিয়াম)	CO_3 (কার্বনেট)
4. কপার সালফেট $CuSO_4$	Cu (কপার)	SO_4 (সালফেট)
5. লেড সালফাইড PbS	Pb (লেড)	S (সালফাইড)

মূলকের আয়নীয় পরিচয় :

অজৈব লবণের উপাদান-পরমাণু বা পরমাণু সমষ্টি ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করার ফলে তড়িৎ আধান যুক্ত কণার সৃষ্টি করে। এই তড়িৎ আধানযুক্ত কণাকেও মূলক বা আয়ন বলে। এমন মূলক একটি পরমাণু বা আয়ন দিয়ে গড়া হলে তাকে বলা হয় 'সরল মূলক' (Simple radical)। অপরপক্ষে একাধিক পরমাণু বা আয়ন দিয়ে গড়া হলে এমন মূলককে বলা হয় যৌগ মূলক (Compound radical)। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, কপার পরমাণু বা আয়ন ইত্যাদি সরল মূলকের উদাহরণ। আবার সালফেট, নাইট্রেট, কার্বনেট ইত্যাদি মূলক বা আয়ন যৌগ মূলকের উদাহরণ।

অজৈব লবণের দ্রবণ তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে দু'টি অংশে বিশ্লেষিত হয়ে আয়ন (ion) গঠন করে। যে অংশ পরা তড়িৎ বা ধনাত্মক তড়িৎ আধান বহন করে, তার নাম ক্যাটায়ন (Cataion)। একে ক্ষারকীয় মূলক, ধাতব মূলক বা পরা তড়িৎধর্মী মূলকও বলা হয়। পরমাণু কর্তৃক ইলেকট্রন বর্জনের ফলে এই শ্রেণীর মূলকের সৃষ্টি হয়।

অপরপক্ষে অজৈব লবণের যে অংশ তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে বিশ্লেষিত হ'য়ে অপরা বা ঋণাত্মক তড়িৎ আধান বহন করে তার নাম অ্যানায়ন (anaion)। একে অ্যাসিডীয় বা আম্লিক বা অপরা তড়িৎধর্মী মূলক বলা হয়। পরমাণুর ইলেকট্রন গ্রহণের ফলে এই শ্রেণীর মূলকের সৃষ্টি হয়।—এই দু'রকম মূলকের কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো।

কয়েকটি অজৈব লবণ	তড়িৎ ধনাত্মক বা ধাতব মূলক	তড়িৎ ঋণাত্মক বা আম্লিক মূলক
1. NaCl	Na^+	Cl^-
2. KNO_3	K^+	$NO_3^=$
3. $CaCO_3$	Ca^{++}	$CO_3^=$
4. $CuSO_4$	Cu^{++}	$SO_4^=$
5. PbS	Pb^{++}	$S^=$

বিভিন্ন তড়িৎ ধনাত্মক বা ক্ষারকীয় মূলকের যোজ্যতা :

একযোজী :

হাইড্রোজেন	(H^+)
অ্যামোনিয়াম	(NH_4^+)
কপার (কিউপ্রাস)	(Cu_2^{++})
সিলভার	(Ag^+)
সোডিয়াম	(Na^+)
পটাসিয়াম	(K^+)
গোল্ড (অরাস)	(Au^+)
মার্কারি (মারকিউরাস)	(Hg_2^{++})

দ্বিযোজী :

বেরিয়াম	(Ba^{++})
ক্যালসিয়াম	(Ca^{++})
ক্যাডমিয়াম	(Cd^{++})
কপার (কিউপ্রিক)	(Cu^{++})
আয়রন (ফেরাস)	(Fe^{++})
ম্যাগনেসিয়াম	(Mg^{++})
ম্যাঙ্গানিজ (ম্যাঙ্গানাস)	(Mn^{++})
মারকারি (মারকিউরিক)	(Hg^{++})
নিকেল	(Ni^{++})
লেড (প্লাম্বাস)	(Pb^{++})
টিন (স্ট্যানাস)	(Sn^{++})
জিংক	(Zn^{++})

ত্রিযোজী :

অ্যালুমিনিয়াম	(Al^{+++})
অ্যান্টিমনি (আস)	(Sb^{+++})
আর্সেনিক (আস)	(As^{+++})
বোরোন	(B^{+++})
ক্রোমিয়াম (ইক্)	(Cr^{+++})
আয়রন (ফেরিক)	(Fe^{+++})
গোল্ড (অরিক্)	(Au^{+++})

চতুর্যোজী :

প্ল্যাটিনাম (ইক্)	(Pt^{++++})
লেড (প্লাম্বিক)	(Pb^{++++})
ম্যাঙ্গানিজ (ম্যাঙ্গানিক)	(Mn^{++++})
টিন (স্ট্যানিক)	(Sn^{++++})

পঞ্চযোজী :

আর্সেনিক	(As^{+++++})
অ্যান্টিমনি	(Sb^{+++++})

বিভিন্ন তড়িৎ ঋণাত্মক বা আম্লিক মূলকের যোজ্যতা :

একযোজী :

অ্যাসিটেট	(CH_3COO^{-})
বাইকার্বনেট	(HCO_3^{-})
বাই সালফেট	(HSO_4^{-})
বাই সালফাইড	(HS^{-})
বাই সালফাইট	(HSO_3^{-})
ব্রোমাইড	(Br^{-})
ক্লোরেট	(ClO_3^{-})
ক্লোরাইড	(Cl^{-})
সায়ানেট	(CNO^{-})
সায়ানাইড	(CN^{-})
ফ্লুওরাইড	(F^{-})
ফরমেট	($HCOO^{-}$)
হাইড্রাইড	(H^{-})
হাইড্রক্সাইড	(OH^{-})
হাইপোক্লোরাইট	(OCl^{-})
আইওডাইড	(I^{-})
মেটা অ্যালুমিনেট	(AlO_2^{-})
মেটা বোরেট	(BO_2^{-})
মেটা ফসফেট	(PO_3^{-})
নাইট্রেট	(NO_3^{-})
নাইট্রাইট	(NO_2^{-})
পারক্লোরেট	(ClO_4^{-})
পারম্যাঙ্গানেট	(MnO_4^{-})
সালফোসায়ানাইড	(CNS^{-})

দ্বিযোজী :

কার্বনেট	(CO_3^{--})
ক্রোমেট	(CrO_4^{--})
ডাই ক্রোমেট	($Cr_2O_7^{--}$)
ম্যাঙ্গানেট	(MnO_4^{--})
অক্জ্যালেট	[$(COO)_2^{--}$
অক্সাইড	(O^{--})
পার অক্সাইড	(O_2^{--})
পার সালফেট	($S_2O_8^{--}$)
সিলিকেট	(SiO_3^{--})
স্ট্যানেট	(SnO_3^{--})
স্ট্যানাইট	(SnO_2^{--})
সালফেট	(SO_4^{--})
সালফাইড	(S^{--})
সালফাইট	(SO_3^{--})
থায়োসালফেট	($S_2O_3^{--}$)
জিংকেট	(ZnO_2^{--})

ত্রিযোজী :

অ্যালুমিনেট	(AlO_3^{---})
অ্যান্টিমোনেট	(SbO_4^{---})
আর্সেনেট	(AsO_4^{---})
আর্সেনাইট	(AsO_3^{---})
বোরেট	(BO_3^{---})
বোরাইড	(B^{---})
ফেরিসায়ানাইড	[$Fe(CN)_6^{---}$
নাইট্রাইড	(N^{---})
ফসফেট	(PO_4^{---})

ফসফাইড	(P''')
ফসফাইট	(PO_3''')

চতুর্যোজী :

কার্বাইড	(C'''')
ফেরোসায়ানাইড	[$Fe(CN)_6$]$''''$
পাইরোফসফেট	(P_2O_7'''')

পজিটিভ ও নেগেটিভ যোজ্যতা :

সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগে (NaCl) Na (সোডিয়াম) ও Cl (ক্লোরিন) উভয়েরই যোজ্যতা এক (1)। আবার ক্যালসিয়াম অক্সাইড যৌগে (CaO) ক্যালসিয়াম (Ca) ও অক্সিজেন (O) উভয়েরই যোজ্যতা দুই (2)। তাই এই সব ক্ষেত্রে সংযোগী মৌলের যোজ্যতার প্রকৃতির পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

তড়িৎযোজী যৌগ (ionic compound) গঠিত হয় পজিটিভ (ধনাত্মক) এবং নেগেটিভ (ঋণাত্মক) আয়ন দ্বয়ের সংযোগে। যথা, $Na^+ + Cl^- \rightarrow (Na^+Cl^-)$। আবার সমযোজী যৌগগুলি (Covalent Compound) তড়িৎ বিশ্লেষ্য (electrolyte) নয় বলে এরা আয়ন গঠন করতে পারে না ; কিন্তু এদের ঋণাত্মক ধর্ম বা তাড়িত ঋণাত্মকতার (electronegativity) মাত্রায় তারতম্য থাকে। কাজেই সমযোজী যৌগদের সংযোগ বা উপাদান মৌলের যোজ্যতা দু'টি নামে চিহ্নিত করা হয়—পজিটিভ যোজ্যতা ও নেগেটিভ যোজ্যতা। তুলনা-মূলকভাবে স্বল্পতর তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের যোজ্যতাকে 'পজিটিভ যোজ্যতা' ধরা হয়। আর তুলনামূলকভাবে উচ্চতর তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের যোজ্যতাকে 'নেগেটিভ' যোজ্যতা' ধরা হয়। উদাহরণ হিসাবে : CO_2 যৌগের যোজ্যতাকে এইভাবে লেখা যায়—

$$C^{+4}O_2^{2(-2)}$$

এমনি আরও কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো।

যৌগ	পজিটিভ যোজ্যতা	নেগেটিভ যোজ্যতা
H·I	H(+1)	Cl(−1)
NaH	Na(+1)	H(−1)
MgO	Mg(+2)	O(2)
$Ca(OH)_2$	Ca(+2)	OH 2(−1)
Na_2CO_3	2(+1)	CO_3 (−2)
$Fe_2(SO_4)_3$	Fe 2(+3)	SO_4 3(−2)
NH_4NO_3	NH_4(+1)	NO_3(−1)

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় যোজ্যতা :

কোন যৌগে তার উপাদান মৌলগুলির যে যে যোজ্যতা ক্রিয়াশীল থাকে, সেই সেই যোজ্যতাকে সেই সেই মৌলের সক্রিয় যোজ্যতা (active valency) বলে। আবার এই সক্রিয় যোজ্যতাগুলি যদি মৌলগুলির সর্বোচ্চ যোজ্যতা হয়, তবে তাদের দ্বারা গঠিত যৌগকে সম্পৃক্ত (Saturated) যৌগ বলা হয়। অপরপক্ষে যৌগটিতে যদি উপাদান মৌলগুলির সর্বোচ্চ অপেক্ষা নিম্নতর কোন যোজ্যতা ক্রিয়াশীল থাকে, তবে যৌগটিকে অসম্পৃক্ত (unsaturated) যৌগ বলা হয়। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও ক্রিয়াশীল যোজ্যতার মধ্যে পার্থক্য প্রকাশক সংখ্যাটিকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত যোজ্যতা (latent valency)।

অসম্পৃক্ত যৌগে কোন মৌলের যোজ্যতার যে অংশ নিষ্ক্রিয় থাকে তা প্রকৃতপক্ষে নষ্ট হয় না। উপযুক্ত সুযোগ পেলেই তা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সংশ্লিষ্ট যৌগটি সম্পৃক্ত হয়।

উদাহরণ হিসাবে কার্বনকে ধরা যাক্। কার্বনের সর্বোচ্চ যোজ্যতা 4. কার্বন ডাই-অক্সাইডে (CO_2) কার্বনের সর্বোচ্চ যোজ্যতা পুরোপুরি সক্রিয় থাকে। কিন্তু কার্বন মনক্সাইডে (CO) কার্বনের সক্রিয় যোজ্যতা 2 : সুতরাং এক্ষেত্রে কার্বনের নিষ্ক্রিয় যোজ্যতা $4-2=2$. CO_2 সম্পৃক্ত এবং CO অসম্পৃক্ত যৌগ। কিন্তু যখন CO-কে বায়ুতে বা অক্সিজেনে দহন করা হয় তখন কার্বনের নিষ্ক্রিয় যোজ্যতা সক্রিয় হয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তার ফলে কার্বন মনক্সাইড পরিণত হয় কার্বন ডাই-অক্সাইডে।

একটু আগে তাড়িত ঋণাত্মকতা, তড়িৎ যোজী যৌগ, সমযোজী যৌগ ইত্যাদি কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এই নতুন শব্দগুলির অর্থ ভালভাবে জেনে রাখা দরকার।

ইলেকট্রো নেগেটিভিটি বা তাড়িত ঋণাত্মকতা :

সমযোজ্যতার প্রয়োজনে বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন আকর্ষণ করার বা ইলেকট্রন গ্রহণ করার ক্ষমতা সমান নয়। যেমন, ক্লোরিন বা অক্সিজেনের পরমাণুর ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা খুবই বেশী। সেই তুলনায় সিজিয়াম বা সোডিয়ামের ঐ প্রবণতা অনেক কম। সমযোজ্যতার ক্ষেত্রে এই ইলেকট্রন আকর্ষণের ক্ষমতাকে বলা হয় পরমাণুর 'তাড়িত ঋণাত্মকতা'।

(ক্রমশঃ)

অজানা মহাকাশে
৮
আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে পেল কেন
আমি কোথায়?
নিরাপদ জায়গায়। চুপচাপ আমাদের সঙ্গে এসো।
আমাদের একজন নেতা দরকার যে যুদ্ধ করতে পারবে।
ওটা কি?
একটা হোভারক্রাফট! আমাদের উপর নজর রাখছে। ভয় পেও না... ওটাকে আমরা অকেজো করে দিয়েছি।

অজানা মহাকাশে

৯

[ক্রমশঃ]

আত্মচরিত

ছেলেবেলার গল্প

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ছোটবেলা থেকেই একমাত্র সাঁতার কাটা ছাড়া কোনরকম খেলাধূলায় আকর্ষণ অনুভব করি নি। অবসর সময় প্রায়ই বন-জঙ্গলে, খাল-বিল, এঁদো পুকুরের ধারে কীট-পতঙ্গ, পাখি এবং ছোট মাছ ও জলপোকার গতিবিধি লক্ষ্য করে কাটিয়ে দিতাম। গাছপালারও অনেক কিছুই নজরে পড়েছিল। কিন্তু অনেক কিছুর তাৎপর্য বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। এই সব সাধারণ

জোপাধ্যায়

দেখাই পরবর্তী কালে আমার কাজে অনেকটা সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তখনকার দেখা কিছুই পুনরায় দেখতে পাই নি।

অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি—আনাড়ি হাতেই একটা টাইমপীস খুলে ব্যালান্স হুইলটার অদ্ভুত দ্রুতগতি এবং অন্যান্য (আপাত) নিষ্ক্রিয়তা দেখে অবাক হয়ে ভাবতাম কেমন করে এটা সম্ভব হচ্ছে। একদিন খেলবার সময় অসতর্কতার ফলে প্রচণ্ড-বেগে যেন স্প্রিংটা খুলে গিয়ে ব্যারেলটা-সমেত উপরে টাঙানো সরু একটা তারের উপর ছিটকে পড়ে 'ব্যালানসড' হয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দোল খেতে লাগল। অন্যান্য জিনিস দিয়ে অনুরূপভাবে ব্যালান্স করবার চেষ্টায় লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে স্কুলের হেডমাস্টার আমাদের কাছে কতগুলি সায়েন্স ম্যাজিক দেখিয়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। তার মধ্যে গোটা দুই ব্যালান্সের খেলাও ছিল। এই সব ব্যাপার থেকেই ম্যাজিক শিখতে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠি। বেশ কয়েক বছর ম্যাজিকের চর্চা করেছিলাম। ইতিমধ্যে ঘড়ি, গ্রামোফোনের যন্ত্রাদি সম্পর্কেও কিছু পরিমাণ দক্ষতা অর্জন করেছিলাম।

এর আগেই রামায়ণ ও মহাভারত অনেকটা পড়েছিলাম। মায়ের ছিল ভয়ানক বই পড়ার ঝোঁক। অনেক রাত জেগে উপন্যাস গল্পের বই পড়তেন, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়তাম। ক্রমশঃ উপন্যাস পড়বার ঝোঁক বাড়তে লাগলো, অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ এবং দু-একখানা বই ছাড়া বিজ্ঞানের বই পড়ার সুযোগ পাই নি। এই সব আজেবাজে জিনিস পড়বার ফলে বেশ ক্ষতি হয়েছিল বটে, কিন্তু লাভও যে কিছু হয় নি, এমন কথা বলতে পারি না। এই সময় থেকেই ছড়া কবিতা লেখবার চেষ্টা করি, পুরনো ঘড়ি, গ্রামোফোন খুলে খুলে যান্ত্রিক কৌশল দেখবার চেষ্টা করি। কলেজে কেমিস্ট্রি ছিল একটি পাঠ্য বিষয়। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য প্রত্যেকবারেই একসেট যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক পদার্থ নিজের হেফাজতে রাখবার জন্য দেওয়া হতো। নিজের ইচ্ছামত পরীক্ষা করতাম, ফসফোরেটেড হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস তৈরি করা, রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে আগুন জ্বালানো এবং অন্যান্য অনেকগুলি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে উৎসাহিত হয়ে উঠতাম।

কেমিস্ট্রির প্রফেসর ক্লাসে আমোনিয়া গ্যাসের পরীক্ষা

দেখিয়েছিলেন। সেটা দেখে উপরে জল তোলবার সহজ পদ্ধতির একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থার নক্সা করে রসায়নের অধ্যাপক তারাপদ চট্টোপাধ্যায়কে দেখিয়েছিলাম, তিনি সেটাতে একটা ভুল দেখিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি কি এটা নিজে করেছ? আমি তাঁর ক্লাসের এক্স্‌পেরিমেণ্ট-এর কথা থেকে কি করে এটা মাথায় এসেছিল—সব বললাম। তিনি আমাকে সায়েন্স নিয়ে পড়বার জন্য বিশেষ করে বললেন। রোজই তাঁর বাড়িতে যেতাম, তিনি বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয় সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। তিনি ঢাকা কলেজে পুনরায় সায়েন্স নিয়ে ভরতি হবার ব্যবস্থাদি করে আমার অভিভাবককে জানালেন। তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না, এর ফলে শেষ পর্যন্ত আর পড়া হলো না। দেশে এসে হাইস্কুলে মাস্টারিতে ঢুকলাম। স্কুল থেকেই আমার জিম্মায় একটি বাগান ও মালী দেওয়া হয়েছিল। ছেলেদের নিয়ে সেখানে গাছপালা সম্বন্ধে সাধ্যমত পরীক্ষাদি করতাম। কৃত্রিম উপায়ে ফুলের পরাগ সঙ্গম ঘটিয়ে সঙ্কর উদ্ভিদ্ তৈরির চেষ্টা, কলমের সাহায্যে একই গাছে দু-তিন রকমের ফুল উৎপাদন করা ইত্যাদি ছিল পরীক্ষার বিষয়।

এর মধ্যেই শতদল নামে একটি হস্তলিখিত মাসিকপত্র প্রকাশ সুরু করেছিলাম। কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে একটা দুঃস্থ সংস্থাও গঠন করি।

রিলিফের কাজে ব্যাপৃত থাকবার সময় সমাজের অবস্থা এবং বিভিন্ন লোকের মতিগতি সম্বন্ধে, নিজের দেখা কয়েকটি ঘটনা নিয়ে কাব্যবিশারদ ধরনে হস্তলিখিত পত্রিকায় কিছু ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করি। কিন্তু সেজন্য নানাভাবে নাজেহাল হতে হয়। পত্রিকাও কিছুকাল বন্ধ রাখতে হয়। তারপরেই স্থানীয় সমাজ ও বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে ছড়া, কবিতা বা গান লিখে নতুন ধরনের একটা জারিগানের দল গড়ে তুলি। এর মধ্যে মাঝে মাঝে মাথায় খেয়াল চাপতো, কিছু ম্যাজিক ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আয়ত্ত করেছিলাম, যেগুলি কাজে লাগিয়ে মানুষকে ভয় দেখানোর এবং কৌতুক সৃষ্টির জন্য অনেক কিছু করেছিলাম।

পূজার্চনা সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে মায়ের সঙ্গে প্রায়ই বাদানুবাদ হতো। একবার ভাইয়ের ভয়ানক অসুখ হয়। ডাক্তার ও কবরেজ যখন আশা ছাড়লেন তখন একদিন স্বপ্ন দেখার ভান করে একটা ওষুধ দিয়ে মাকে দিলাম, ওষুধ ধারণ করবার পর রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করে। এই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করে পদ্যছন্দে একটি ব্রতকথা লিখে ছাপিয়ে দিলাম। নাম 'আপদ-বিনাশিনীর ব্রতকথা' বইটি ঘরে ঘরে প্রচারিত হলো। এমন কি আজও বোধ হয় এই ব্রতকথা কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। প্রচারের পর মাকে সমস্ত বিষয়টা যে মিথ্যা তা খুলে বলে এগুলির অসারতার কথা বুঝিয়ে দিলাম, অন্য লোকদেরও বললাম, কিন্তু কেউ আমার এই কথা সত্য বলে মানতে রাজি হন নি।

তারপর কলকাতায় একটি ছেলেকে পাই, বয়স ২৫-এর মত, ভাল গান গাইতে পারে। পল্লীগীতিতে 'নিমাই সন্ন্যাস' ও 'লালাবাবুর দীক্ষা' নামে দুটি পালাগান লিখে তাদের দিয়ে গাইবার ব্যবস্থা করেছিলাম। বেশ বড় দল হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষীয়সী ও বৃদ্ধাদের নিয়ে পদ্মপুরাণ, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীর গানের একটা আসরও গড়ে তুলেছিলাম। ১৯২০-তেই সম্ভবত 'কাজের লোক' (Businessman) ও পরে 'সনাতন' পত্রিকার ভার নিয়েছিলাম।

ছেলেবেলার অনেক ঘটনার কথাই ভুলে গেছি, তবে কোন কোন ঘটনার অনেক কিছু স্মৃতিই রয়ে গেছে—কতক ঝাপ্‌সা, কতক পরিষ্কার। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে যোগেন মাস্টারের কথা। মাঝে মাঝে যোগেন মাস্টার ছেলেদের ডেকে এনে ম্যাজিকের খেলা দেখাতেন। একটা মজার জিনিস দেখাবেন বলে একদিন তিনি ক্লাস রুমে মাস্টার, ছাত্র সবাইকে ডেকে নিয়ে এলেন। পকেট থেকে গাঢ় খয়েরী রঙের কতকগুলি বিচি বের করে মাস্টারদের হাতে দিয়ে বললেন—দেখুন তো জিনিসটা কি এবং এতে কোন ছিদ্র বা টুটা-ফাটা আছে? দেখতে কতকটা কাঁই বিচির মত মনে হলেও আসলে তা নয়, কোন একটা অজানা ফলের বিচি—মসৃণ ও গোলাকার, কোথাও কোন টুটা-ফাটা নেই। বিচিগুলি টেবিলের উপরে রাখার কয়েক মিনিট পরেই একটা বিচি হঠাৎ প্রায় চার ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠলো। তারপর এদিক-ওদিক থেকে প্রায় সবগুলি বিচিই থেকে থেকে লাফাতে সুরু করে দিল। অবাক কাণ্ড। কিভাবে এটা সম্ভব হতে পারে? আমরা তো ছেলেমানুষ, বড়রাই কিছু বুঝতে পারেন নি। অবশেষে মাস্টার মশাই ছুরি দিয়ে একটা বিচি চিরে ফেলতেই দেখা গেল, তার ভিতরে রয়েছে একটা পোকা (Larva)। টেবিলের উপর পড়েই পোকাটা ধনুকের মত শরীরটাকে বাঁকিয়ে দু-প্রান্ত একত্রিত করে অদ্ভুত ভঙ্গীতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো।

এই ঘটনা থেকেই কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় সম্বন্ধে

একটা কৌতূহল জাগতে লাগলো। নতুন কোন পোকা-মাকড় বা গাছপালার কোন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়লে বিস্ময় জাগতো বটে, কিন্তু সুসংবদ্ধ জ্ঞানের অভাবে তার প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করবার ক্ষমতা ছিল না।

স্কুলের গ্রাম্য জীবনের শেষে শহরাঞ্চলের পালা। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ। গাছপালা কীট-পতঙ্গের কথা একরকম ভুলেই গেলাম। একটা ঘটনায় পদার্থ-বিদ্যার দিকে ঝোঁক পড়লো। একটা সুযোগও এসে গেল। পদার্থবিদ্যার পরীক্ষামূলক দিকটা এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে, তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না। যা হোক কিছুকাল পরে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বাধ্য হয়ে পল্লীগ্রামে ফিরে এসে শিক্ষকতার কাজে কর্মজীবন সুরু করতে হলো।

সন্ধ্যার পর একদিন স্কুল বোর্ডিং-এ কয়েকজন বসে গল্প করছি। বর্ষাকাল, অনবরত টিপ টিপ বৃষ্টি চলছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেল—মুষলধারে বৃষ্টি। বোর্ডিং-এর কিছু দূরেই গাছপালাবর্জিত একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝখানে, মাটি থেকে প্রায় ৩/৪ হাত উঁচুতে এই বৃষ্টি-ধারার মধ্যেই হঠাৎ যেন একটা আগুনের গোলা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে ছুটাছুটি করে কিছুদূর গিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা নজরে পড়েছিল অনেকেরই। কাজেই স্থান, কাল, পাত্রানুযায়ী এসব ক্ষেত্রে যা হয়, স্বভাবতঃই সেই ভৌতিক কাণ্ডের আলোচনা সুরু হয়ে গেল। কয়েকজন ছিলেন ভৌতিক কাণ্ডে বিশ্বাসী। জন দুই তারস্বরে ভৌতিক ব্যাপারে তাঁদের অনাস্থার কথা ঘোষণা করলেন। তাঁদের কথায় মনে হলো—যুক্তির চেয়ে তাঁদের শিক্ষা-ভিমান আহত হবার আশঙ্কাই এই অনাস্থা প্রকাশের কারণ। ভৌতিক ব্যাপার সম্পর্কে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। কাজেই আমি বিশ্বাসীর দলেও নই, অবিশ্বাসীর দলেও নই। এই আলোচনার মধ্যে একজন বলে উঠলেন—এসব ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে তর্ক না করে রাত্রিবেলায় একদিন এই গ্রামের দক্ষিণ দিকে পাঁচীর মার ভিটাতে গেলেই হয়তো আপনাদের ধারণা বদ্‌লে যাবে।

অন্ধকার রাত্রিতে এই গ্রামের অনেকেই নাকি পাঁচীর মার ভিটাতে আগুন জ্বলতে দেখেছে। কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো—পাঁচীর মার ভিটার ব্যাপারটা দেখতেই হবে। ভূত বিশ্বাস করি বা না করি সংস্কারটা পুরাপুরিই ছিল। স্থান এবং সময় বিশেষে একটা অজানা আশঙ্কায় যেন গা ছম ছম করে ওঠে। যা হোক, দু'-একদিনের চেষ্টায় সঙ্গী হবার জন্যে দু'-জনকে রাজী করানো গেল। দিন কয়েক পর দু'জন সঙ্গী নিয়ে পাঁচীর মার ভিটার দিকে রওনা হলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—অনবরত টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। সঙ্গে ছাতা, লণ্ঠন ও দেশলাই নিয়েছি। ঝোপঝাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কর্দমাক্ত পিছল রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে। এই রাস্তা ধরেই অনেক কষ্টে পাঁচীর মার ভিটার উত্তর প্রান্তে এসে পড়লাম। চারদিক ঘন জঙ্গলে ঘেরা খোলা মাঠের মত একটা বিস্তীর্ণ জায়গা। মাঝখানে কোন বড় গাছপালা নেই—কাজেই জায়গাটা অনেকটা ফর্সা। কিন্তু চারদিকের বড় বড় গাছের ছায়ায় মেঘলা রাতের অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। দক্ষিণ দিকে কয়েকটা বড় বড় গাছ যেন জমাট অন্ধকারের বোঝা মাথায় করে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেও কতকগুলি বড় বড় গাছ। অন্ধকারটা যেন সেই দিকেই বেশী গাঢ়। আশেপাশে লোকালয় নেই। খুব দূরে দু-একখানা ঘর দেখা যায় মাত্র। চতুর্দিকে ব্যাঙের ঐকতান আর উই-চিংড়ে ও গুবরে পোকার একটানা রি-রি শব্দ। একলা নই, সঙ্গে আলোও আছে, তবুও কেমন যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম।

একটু একটু করে মাঠের প্রায় মাঝখানটায় এসে পড়লাম। মাঝে মাঝে এক একটা লতাগুল্মের ঝোপ। এরূপ একটা ঝোপের আড়াল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সেই জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা দেখা গেল। লণ্ঠন আড়াল করে সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আবার কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম—স্পষ্ট আলো, কোন পরিবর্তন নেই। আর একটা ঝোপ ঘুরে অনেকটা কাছে যেতেই সেই ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগুলির নীচে আলোটাকে আরও বেশী উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখা গেল!

আরও অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা ভাবছি—ইতিমধ্যে আলোটা যেন হঠাৎ নিবে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। কিছুক্ষণ ধরে ক্রমাগত এরূপ ব্যাপারই ঘটতে লাগলো। তারপরেই আবার একটানা স্থির আলো। সঙ্গীদের একজন আগেই চলে গিয়েছিলেন। আর একজন যিনি ছিলেন, তিনিও অনেকটা দূরে ফাঁকা জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিলেন—এগুতে ভরসা পান নি। অবশ্য উভয়েই আমরা জোরে জোরে কথা বলছিলাম। সঙ্গীটি ফিরে আসবার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। ভয়ে

আমার গা ছম ছম করছিল বটে, কিন্তু তবুও যেন কেন মনে হচ্ছিল—ওটা ভৌতিক ব্যাপার নয়—অন্য কিছু একটা হবে। সঙ্গীর অনুরোধ উপেক্ষা করে আরও খানিকটা এগিয়েই দেখা গেল প্রায় ৪-৫ হাত দূরেই বেশ বড় একটা অগ্নিকুণ্ড। আগুনের শিখা নেই। কাঠকয়লা পুড়ে যেমন গনগনে আগুন হয়, অনেকটা সেই রকম। আলোর তীব্রতা নেই। স্নিগ্ধ নীলাভ আলোতে আশেপাশের ঘাস-পাতাগুলি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কাঁতত একটা গাছের গুঁড়ি থেকে আলো নির্গত হচ্ছিল। সমস্ত গুঁড়িটাই জ্বলে জ্বলে যেন একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে।

এই অপরূপ দৃশ্য আর কখনও নজরে পড়ে নি। বিস্ময়ের পরিসীমা রইলো না। গুঁড়িটার অনেকটাই পচে গেছে। গুঁড়িটার পাশেই, আমাদের দিকে, বেশ বড় একটা কচুগাছ জন্মেছিল। তার একটা পাতা এমন ভাবে হেলে পড়েছিল যে, একটু বাতাসেই উপরে-নীচে উঠা-নামা করে আন্দোলিত হতো। দূর থেকে আলো-টাকে একবার জ্বলতে আবার নিবতে দেখেছিলাম—এখন তার প্রকৃত কারণ বোঝা গেল। গুঁড়িটার গা থেকে আলো বিকিরণকারী কতকগুলি কাঠের কুচি সংগ্রহ করে অক্ষত দেহে পাঁচীর মার ভিটা থেকে ফিরে এলাম। প্রত্যেকটি কাঠের টুকরা সারা রাত নীলাভ আলো বিকিরণ করতো, কিন্তু দিনের বেলায় কিছুই দেখা যেত না। দিন দুই পরে আলো দেওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণ কাঠের টুকরা কেন আলো বিকিরণ করে, চেষ্টা করেও তখন তার কারণ বুঝতে পারি নি।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে রাত্রিবেলায় একটা বৃহৎ জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় রাস্তার উভয় দিকের জঙ্গলের মধ্যে জোনাকির আলোর মত অসংখ্য আলোক-বিন্দু নজরে পড়ে গেল। কিছুটা তুলে এনে বাতির আলোয় দেখলাম—কতকগুলি লতাপাতা থেকেই এই রকম আলো নির্গত হচ্ছে। পূর্বের দেখা আলোর মত এই আলোও স্নিগ্ধ নীলাভ এবং খুবই উজ্জ্বল। শুষ্ক দিনেও বনে-জঙ্গলে পিচ্‌কিরির সাহায্যে জল ছিটিয়ে দিলে রাত্রিবেলায় এই আলো দেখা যায়।

ইচ্ছামত যখন তখন এই আলো-দেওয়া লতাপাতা সংগ্রহ করবার সন্ধান জানবার ফলে এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবার পথে খুব সুবিধা হলো। সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যতটা করা সম্ভব, ততটা করে কিছু কিছু তথ্য জানা গেল বটে, কিন্তু আর বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না। 'প্রবাসী'তে এই গাছের আলো সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রকাশিত হবার ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকে আরও অনেক রকম আলো-দেওয়া জিনিসের কথা জানিয়ে-ছিলেন। এর ফলে এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উৎসাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগলো।]

ছাত্র-ছাত্রীদের
অপরিহার্য
বই

গোপালচন্দ্রের প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা

পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করবার ক্ষমতা

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

[১৩২৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকার 'পশুশস্য' বিভাগে গোপালচন্দ্রের এই রচনাটি প্রকাশিত হয় এবং এই রচনাটি আচার্য জগদীশচন্দ্র পড়েন এবং পরের মাসেই 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয় তাঁর 'গাছের আলো' শীর্ষক রচনা এবং ১৩২৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতেও তাঁর 'গাছের আলো' শীর্ষক একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই রচনার লেখক সম্বন্ধে কৌতূহলী হন এবং বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে এই লেখক সম্বন্ধে আচার্যদেবের আলোচনা হয় এবং পুলিনবাবুই গোপালচন্দ্রকে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করান।]

কিছুক্ষণ আগে খুব এক পশলা বৃষ্টি নেমে গেছে। অন্ধকার রাত, একটা রাস্তা দিয়ে চলছি সঙ্গে আলো নেই, দুই ধারে ছোট ছোট জংলী গাছ। হঠাৎ একটা জায়গায় দেখলাম যেন অসংখ্য জোনাকী জ্বলছে। সেখানটায় অন্ধকার একটু বেশী, কারণ উপরের দিকটা গাছ গাছড়ায় ঢাকা। আরেকটু এগিয়ে গেলাম দেখি, সেই রকমের আলো জ্বলছে। রাস্তাটির-দু-পাশেই ওই রকমের আলো। আরও আশ্চর্য একটা আলোও একটু নড়েচড়ে না। সন্দেহ হলো—অতগুলি জোনাকী একেবারে চুপচাপ বসে আছে? কারণ কি? একটা লাঠি দিয়ে জঙ্গলটাকে খুব নেড়ে দিলাম। তবুও সেই আগেকার মতন স্থিরভাবে জ্বলছে, তখন মনে হলো এগুলি তবে কেঁচোর রস—কারণ কেঁচোর রসও ঠিক ওইভাবে জ্বলে। লাঠি দিয়ে খুব জোরে ওই রকমের আলোসহ খানিকটা মাটি আঁচড়ে তুলে নিলাম। বাতির আলোতে গিয়ে দেখি আর কিছুই নয়, খানিকটা মাটি আর এক গাছা মরা দুর্বা। বাতির জোরালো আলোর কাছে ওটাই যে আলো দিচ্ছিল—সেটা মোটেই দেখা গেল না। অন্ধকারে নেওয়া মাত্রই আবার জ্বলন্ত ইলেকট্রিক বাতির কার্বন তারটার মত জ্বলতে আরম্ভ করল।

তখন ওই রকমের আরো কতগুলি আলোর টুকরা সংগ্রহ করে. দেখি যে, সেগুলো কেবলই দুর্বা ঘাস নয়, পচা আম-পাতা, কাঁঠাল-পাতা, আনারস-পাতা আরো গাছের ছোট্ট পচা ডালপালা অনেকই আছে। সবগুলির আলো একই রকমের খুব সুন্দর। সেগুলিকে লতা, পাতা, ফুল, ফল, ইত্যাদি অনেক রকমের মালা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলাম—সারা রাত খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু তার পরের দিন রাত্রিতে দেখি—তারা আর মোটেই আলো দেয় না। কারণ অনুসন্ধানে বোঝা গেল বৃষ্টির জলে ভিজেই এগুলি এমন সুন্দর সুন্দর আলো দিতে পেরেছিল। আবার সেগুলিকে জলে ভিজিয়ে দিলাম। খানিক পরে দেখি সেই রকমের দিব্যি আলো।

একবার মনে হয়েছিল ফস্‌ফরাসের মত কোন জিনিস্ নিশ্চয়ই এতে আছে. কিন্তু তা থাকলে শুকনো পাতাই বা আলো দিতে পারবে না কেন? তার পরে আরও বিশেষ করে দেখলাম---সব জায়গার পচা জিনিসই ভিজলে ও-রকম আলো দিতে পারে না। কেবল যেগুলি গাছপালা বা ঝোপঝাড়ের নীচে ছায়ায় থেকে থেকে পচে, তারাই অমন আলো দিতে পারে।

কিছুদিন পরে একদিন শুনলাম একটা অন্ধকার বাগানে নাকি মাঝে মাঝে প্রায়ই আলেয়ার আলোর মত খুব বড় একটা আলো দেখা যায়। কৌতূহলের খাতিরে একদিন রাত্রি ১০৷৷ টার সময় সেটা দেখতে গেলাম। সেদিনও বিকেল বেলায় খুব ভারী বৃষ্টি হয়ে গেছে। দেখলাম সত্যি সত্যিই আগুনের কুণ্ডের মত একটা স্থির আলো জ্বলছে। জন দুই সেখানটায় গিয়ে দেখি একটা পুরানো গাছের গোড়া। শিকড়ের দিকটা বৃষ্টির জলে ভিজে তখন আলো বের হচ্ছিল। এটাও ওই পচা লতা-পাতার মত ছায়ায় থেকে থেকে পচেছিল! এ ব্যাপারে প্রকৃত রাসায়নিক তথ্যটা প্রবাসীর মারফৎ সবিস্তারে কেউ জানাতে পারলে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হতো। কারো পরীক্ষার দরকার হলে ওরকম দু-এক খণ্ড আলো-দেওয়া পচা পাতা বা আর কিছু পাঠাতে পারি।

শিকারী গাছের কথা

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাণীদের মধ্যে একে অন্যকে হত্যা ক'রে জীবন ধারণ করে—এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তোমরা দেখে থাকবে। কিন্তু উদ্ভিদেরা জ্যান্ত প্রাণীদের ধরে খায়—এরূপ ব্যাপার কখনও প্রত্যক্ষ করেছ কি? তোমাদের অনেকেই হয়ত এরূপ শিকারী উদ্ভিদের কথা পড়েছ; কিন্তু আমাদের দেশেও যে এরূপ অনেক শিকারী উদ্ভিদ রয়েছে সে খবর বোধ হয় অনেকেই রাখ না। একটু কষ্ট স্বীকার করে খোঁজ করলে আমাদের দেশে এমনকি কলকাতার আশেপাশে খালবিলে অথবা বালুকাময় পতিত জমিতে এ ধরনের অনেক উদ্ভিদ দেখতে পাবে।

বিভিন্ন জাতের গাছপালা যে অপূর্ব কৌশলে জীবন্ত প্রাণীদের ধরে উদরস্থ করে—একথা জানা গেছে বহুকাল পূর্বেই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারশ' বিভিন্ন জাতের শিকারী উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু ৪০/৫০ বছর পূর্বেও শিকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে এমন সব রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচলিত ছিল, যা শুনে ভয়ে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত। অনেকে আবার প্রত্যক্ষদর্শীর মত কোন কোন উদ্ভিদের মানুষ-শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মাঝে মাঝে এখনও যে এমন দু-একটা কাহিনী শোনা যায় না এমন নয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে এলে বানুর নামে একটা দ্বীপ আছে। লোকে এটাকে বলে—মৃত্যুর দ্বীপ। ১৮৫১ সালে ক্যাপ্টেন আর্করাইট বলেছেন যে, তিনি এই দ্বীপে একরকমের অদ্ভুত ফুল দেখেছিলেন। ফুলটা নাকি এত বড় যে, একটা মানুষ অনায়াসে তার ভিতরের গর্তের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। গর্তটা নাকি ছোটখাট একটা গুহার মত। ভিতরটা যেমন রঙচঙে তেমনি সুগন্ধে ভাঁত। গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যদি কেউ সেই ফুলের গর্তে ঢুকে পড়ে তবে তার আর রক্ষা নেই। গন্ধের অপূর্ব মাদকতা শক্তির বলে সে সেখানে অসাড় হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলের পাপড়িগুলো উল্টে এসে তার বহির্গমনের পথ বন্ধ করে দেয়। শিকার হজম হয়ে গেলে পাপড়ি মেলে ফুলটা আবার নতুন শিকারের সন্ধানে হাঁ করে বসে থাকে।

আমেরিকান ন্যাচারেলিস্ট মিঃ ডানস্টান একরকম শিকারী লতাগাছের কথা বলেছেন। নিকারাগুয়ার জলা-ভূমিতে উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর কুকুরটা নাকি এরকমের একপ্রকার লতাগাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে মেক্সিকোর সিয়েরা ম্যাডার নামক অঞ্চলের সর্প-বৃক্ষ নামে একরকম প্রাণী শিকারী উদ্ভিদের বিবরণ জানা যায়। এই উদ্ভিদের নাকি সাপের মত কতকগুলো ডাল বেরোয়। এই ডাল-ভয়ানক স্পর্শ-কাতর। পাখি বা অন্য কোন ছোট প্রাণী এর উপর বসামাত্রই ডালগুলো তাকে জড়িয়ে ফেলে এবং বেমালুম গাছের ভিতর টেনে নিয়ে যায়। এক পর্যটন-কারী বলেছেন যে, দৈবাৎ এরকম একটা ডালের সংস্পর্শে আসামাত্রই ডালটা তার হাত জড়িয়ে ধরে। অতিকষ্টে ছাড়িয়ে আনতে পারলেও তার হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়—ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের মানুষ-খেকো গাছ সম্বন্ধে। আফ্রিকার পূর্বদিকে ম্যাডাগাস্কার একটা বৃহৎ দ্বীপ। এই দ্বীপে নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। ডাঃ কার্ল লাইক নামে এক ভদ্রলোক সর্বপ্রথম ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের মানুষ-খেকো গাছের কথা প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি নাকি স্বচক্ষে এরকম একটা দৃশ্য দেখেছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এমন কি, ১৯২০ সালেও এই বিবরণীর পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। ডাঃ লাইকের বিবরণ থেকে জানা যায়—এই মানুষখেকো গাছটা নাকি দেখতে বিরাট একটা আনারস গাছের মত। স্থানীয় অধিবাসীরা এই গাছকে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করে থাকে। গাছের কাণ্ডটা প্রায় দশফুট উঁচু প্রকাণ্ড একটা পিপের মত। গাছটার মাথার দিক থেকে ১০/১২ ফুট লম্বা এবং ফুটখানেক চওড়া ৮টা চ্যাপ্টা পাতা ঝুলে থাকে। পাতাগুলোর ডগার দিকটা ক্রমশঃ সরু হতে হতে সূচের মত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। তাছাড়া পাতার গায়ে অসংখ্য বিষাক্ত কাঁটাও আছে।

একবার রাত্রিবেলায় এরূপ একটা গাছের কাছে একটি মেয়েকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা ডাঃ লাইককে এই অনুষ্ঠানটা দেখাতে নিয়ে যায়। অধি-বাসীরা একটি যুবতী স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে এসে তাকে গাছটার উপরে উঠিয়ে সেখানে সঞ্চিত একরকমের তরল পদার্থ পান করতে বাধ্য করলো। ডাঃ লাইক লিখেছেন

—"আমি ভেবেছিলাম, মেয়েটা গাছটার উপর থেকে লাফিয়ে পড়বে এবং ব্যাপারটার ওখানেই যবনিকাপাত হবে। কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা তা নয়; ওখানে কি ঘটছে সেটা হৃদয়ঙ্গম করে একটা অস্বাভাবিক ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে গাছটাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল এবং অসাড় বলে মনে হচ্ছিল, সে যেন অকস্মাৎ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

যে সবুজ পাতাগুলোকে শক্ত ও অনমনীয় বলে মনে হয়েছিল সেই পাতাগুলোই মেয়েটাকে সাপের মত আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে মোচড় দিতে লাগল। মেয়েটা তখন বস্তুপিণ্ডের মত নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল, সেই সময় এমন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য নজরে পড়লো যা জীবনে কখনও ভোলবার নয়। সেই বিরাট পাতা-গুলো খুব ধীরে ধীরে খাড়া হতে লাগলো। তারপর চাপদেওয়া মেশিনের মত প্রচণ্ড চাপে ভীষণ-দর্শন কাঁটা-গুলোকে শরীরে বিদ্ধ করে মেয়েটাকে সম্পূর্ণরূপে মুড়ে ফেললো।"

দুঃখের বিষয়, এসব রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আজ পর্যন্ত এরূপ কোন শিকারী গাছের খবর পাওয়া যায় নি। যে সব শিকারী গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে তারা কীট-পতঙ্গ বা ছোটখাট পাখি এবং টিকটিকি, ব্যাং, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীদের শিকার করেই দেহসাৎ করে মাত্র। এদের শিকার ধরার কৌশল যেমন বিচিত্র তেমনই কৌতূহলো-দ্দীপক। শিকারী উদ্ভিদের অনেকেই জলে অথবা জলাভূমিতে জন্মে থাকে। তাই নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করবার জন্যে তারা প্রাণীদেহ আত্মসাৎ করবার উপায় বেছে নিয়েছে। অবশ্য প্রাণীজ নাইট্রোজন ছাড়াও চলে এমন অনেক গাছ আছে; কিন্তু প্রাণীজ নাইট্রোজেন সংগ্রহের ফলে এদের দেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির অনেক সহায়তা হয়ে থাকে। এছাড়া ব্যাঙের ছাতা জাতীয় অনেক উদ্ভিদ আছে যারা খাদ্যের জন্যে প্রাণীদের উপরই নির্ভর করে থাকে। বিভিন্ন জাতের শিকারী উদ্ভিদ বিভিন্ন রকমের ফাঁদ পেতে শিকার আয়ত্ত করে। কারোর থাকে গর্ত-ফাঁদ, কারোর আঠালো পাতার ফাঁদ, কারোর বজ্র-আঁটুনি ফাঁদ আবার কারোর থাকে ইঁদুর ধরা ফাঁদ। গর্ত-ফাঁদের মধ্যে ঘটি-লতা, শিকারীর শিঙ্গা প্রভৃতির ফাঁদের কৌশলই বোধ হয় সবচাইতে সরল। কারণ শিকার ধরবার জন্যে এদের মোটেই নড়াচড়া করতে হয় না। ঘটি বা শিঙ্গার ঢাকনাটা খুলে হাঁ-করে বসে থাকে। লোভের বশে কীটপতঙ্গ এসে গর্তের ভিতরে ঢুকে যায়। নীচের দিকে মুখকরা শোঁয়ার দরুন আর বেরিয়ে আসতে না পেরে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ আমেরিকার হেলিয়ামফোরা, উত্তর আমেরিকার সারাসেনিয়া, আমাদের দেশীয় নেপেনথেস্ প্রভৃতি শিকারী উদ্ভিদেরা এইভাবেই শিকার ধরে থাকে। অন্যান্য শিকারী-উদ্ভিদগুলো কেউ উজ্জ্বল রং, কেউ গন্ধ, কেউ মধু এবং কেউবা সুমিষ্ট আঠার সাহায্যে শিকারকে আকৃষ্ট করে ফাঁদে চেপে ধরে। ভেনাস ফ্লাই-ট্র্যাপ, ডাইওনিয়া ব্র্যাডারওয়ার্ট, সূর্য-শিশির, জেন্‌লিসিয়া, ড্রসোফাইলাম, ইউট্রিকুলেরিয়া প্রভৃতি এ ধরনের উদ্ভিদ।

সূর্য-শিশির, ড্রসোফাইলাম প্রভৃতি শিকারী উদ্ভিদ-গুলোর পাতার গায়ে ছোট ছোট ফোঁটার মত আঠালো পদার্থ লেগে থাকতে দেখা যায়। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ পাতার উপর উপবেশন করলে আঠায় জড়িয়ে যায়। অনেক উদ্ভিদের আঠা যেমন একটু টানলেই সুতার মত লম্বা হয়ে আসে এদের আঠা সে রকমের নয়। মশা-মাছি পাতার উপর বসামাত্রেই এই আঠা ডেলার মত তাদের গায়ে লেগে যায়। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করবার ফলে ক্রমশঃ অনেকগুলো আঠার ডেলা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় লেগে যাওয়ায় সে আর উড়ে পালাতে পারে না এবং উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এভাবে আটকে পড়ে মশার মত প্রাণী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হজম হয়ে গেছে। ডায়োনিয়া প্রভৃতি শিকারী উদ্ভিদের পাতার দুধারে দাঁতের মত কতকগুলো সংকোচনশীল শোঁয়া আছে। কোন কীট-পতঙ্গ পাতার উপর বসামাত্রই ধারগুলো দাঁতে দাঁতে মুড়ে দিয়ে শিকারকে ইঁদুর-কলের মত চেপে ধরে। কোন কোন ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ অদ্ভুত উপায়ে শিকার ধরে থাকে। এরা সাধারণতঃ ইল-রয়ার্ম নামে একরকমের কৃমিজাতীয় পোকা শিকার করে। তোমরা বোধহয় 'ল্যাসোর' কথা শুনেছ। অতি সহজ উপায়ে বুনো জীব-জন্তু ধরার জন্য 'ল্যাসো' ব্যবহৃত হয়। একপ্রান্তে আলগাভাবে ফাঁস পড়ানো একটা লম্বা দড়িকে বলা হয়—'ল্যাসো'। দড়িটাকে গুটিয়ে নিয়ে শিকারী অব্যর্থ লক্ষ্যে ধাবমান জন্তুর উপর ছুঁড়ে দেয়। ফাঁসটা গলায় জড়িয়ে গিয়ে জন্তুটা আটকা পড়ে যায়। অনেক শিকারী 'ল্যাসো' দিয়ে বাঘ, ভাল্লুক, অজগর প্রভৃতি হিংসপ্রাণীকেও জীবন্ত ধরে আনে। ড্যাকটিলেরিয়া নামে একজাতীয় ছত্রাকের সুতার মত লম্বা শিকড়ের ডগার দিকে 'ল্যাসোর' মত ফাঁস থাকে। ঘোরাফেরা করবার সময় কোন কৃমি-পোকা অসাবধানে ওই ফাঁসের মধ্যে ঢুকে পড়লে আর

রক্ষা নেই। সংগে সংগেই ফাঁসের কোষগুলো ফুলে উঠে শিকারটাকে চেপে ধরে। পরে নতুন নতুন ছত্রাক-সূত্র বেরিয়ে এসে শিকারের দেহের ভিতর প্রবেশ করে। কোন কোন ছত্রাক-সূত্রের ফাঁসটা থাকে ভয়ানক আঠালো। শিকার সেই আঠায় আটকে যায়।

আগেই বলেছি, আমাদের দেশের কয়েক রকমের শিকারী উদ্ভিদ দেখা যায়। এদের কয়েকটার শিকার প্রণালী যতটা লক্ষ্য করেছি, সেকথা বলছি। অনেকদিন আগে আমাদের লেবোরেটরীর (বসু বিজ্ঞান মন্দিরের) গাছ-ঘরে শিলং বা ওদিককার কোন অঞ্চল থেকে আনা কয়েকটা ঘটি-লতা গাছ লাগানো হয়েছিল। গাছগুলো প্রায় মানুষের সমান উঁচু। পাতাগুলো বেশ লম্বা এবং চওড়া। পাতার ডগায় একটা সরু, লম্বা বোঁটা। প্রত্যেকটা বোঁটার শেষের দিকে বেশ বড় একটা ঘট খাড়াভাবে থাকে। ঘটটা লম্বায় ৪।৫ ইঞ্চির কম নয়। ঘটগুলি দেখতে সাধারণ মাটির ঘটেরই মত কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটা ঘটই একদিকে খানিকটা বাঁকানো। প্রত্যেকটা ঘটের মুখে কব্জাওয়ালা

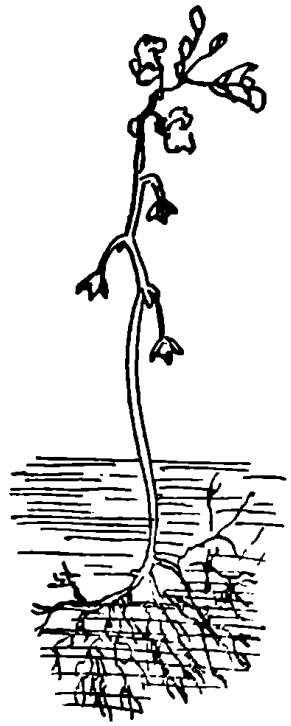

জলজ শিকারী উদ্ভিদ—ইউট্রিকুলেরিয়া

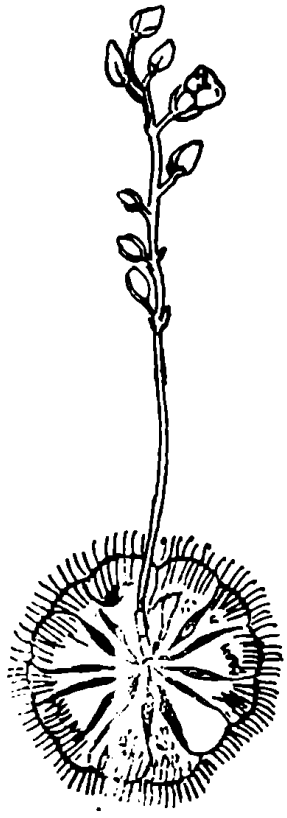

শুকাময় স্থানের শিকারী উদ্ভিদ ড্রসেরা

ঢাকনার মত একটা ছোট্ট পাতা আছে। এই ঢাকনা-পাতাটাকে সবসময়েই প্রায় আধবোজা অবস্থায় থাকতেই দেখেছি। ঘটের কানাটা দেখে মনে হয় যেন মানুষের হাতের তৈরী। কোন সুনিপুণ কারিগর যেন একগাছা সূক্ষ্ম তার স্প্রিঙের মত করে কানাটার গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। কতকটা অস্বাভাবিক পরিবেশে থাকার জন্যে বোধ হয় গাছগুলোর উপর অনেকদিন পর্যন্ত কোন পোকা-মাকড়ের আনাগোনা দেখতে পাই নি। যা হোক ওদের শিকার-কৌশলটা প্রত্যক্ষ করবার আগ্রহে কয়েকটা ঘটের ঢাকনার উপর খানিকটা চিনির রস ছড়িয়ে দিয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে সুরু করলাম। প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল। চিনির লোভে একটা, দুটা করে ক্রমশঃ অনেকগুলো বড় বড় ডেয়ো-পিঁপড়ে এসে পাতার উপর ভিড় জমাতে লাগলো। কিন্তু একটারও ঘটের ভিতরে ঢোকবার আগ্রহ দেখা গেল না চিনি খেতেই সবাই ব্যস্ত। পরের দিন গিয়ে দেখি—চিনির চিহ্নমাত্র নেই—তবুও পিঁপড়েরা লোভ ছাড়তে পারে নি পাতার উপর, ঘটির গায়ে—বোধ হয় চিনির সন্ধানেই আনাগোনা করছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখলাম, অতিমাত্রায় কৌতূহলী একটা পিঁপড়ে ঘটের কানা বেয়ে খানিকটা.

ভিতরে চলে গেছে। ভেবেছিলাম. হয়তো ঢাকনাটা তখনই বন্ধ হয়ে গিয়ে পিঁপড়েটাকে আটক করে ফেলবে কিন্তু ঢাকনাটার সেরকমের কোন লক্ষণ্ দেখা গেল না। পিঁপড়েরা কিন্তু আর ভিতরে না গিয়ে, খানিক বাদেই বেরিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে দেখি, দুটো পিঁপড়ে এসে প্রায় এক সংগেই ঘটের ভিতরে উঁকি মেরে দেখছে, একটা একটু বেশী ভিতরে গিয়ে নীচের দিকে মুখকরা সূক্ষ্ম শোঁয়াগুলোর উপর টাল সামলাবার চেষ্টা করছিল। ইতিমধ্যেই হঠাৎ যেন পিঁপড়েটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুসন্ধানে বুঝলাম—পিঁপড়েটা পা পিছলে ঘটের ভিতড়ে পড়ে গেছে। দিন তিনেক পরে একটা ঘট চিরে তার ভিতরে অর্ধ-গলিত বড় একটা উচ্চিংড়ি এবং গোটা সাতেক ডেয়ো-পিঁপড়ে পাওয়া গেল।

করছিল কিন্তু এদিকে যে আবার অন্যান্য শোঁয়াগুলো মুড়ে এসে তাকে বন্দী করবার উদ্যোগে ছিল—এবিষয়ে মোটেই কোন ধারণা ছিল না। প্রায় ঘণ্টা খানেক সময়ের মধ্যে শোঁয়াগুলো মুড়ে গিয়ে পোকাটাকে বেমালুম বন্দী করে ফেললো। এ অবস্থায় খানিকটা মাটি সমেত গাঁছটাকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম। একদিন পরে পাতাটার সেই কোঁচকানো অংশটুকু ছিঁড়ে তার মধ্যে পোকাটার শরীরের সামান্য এক আধটুকু চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই নি।

বর্ষাকালে মানিকতলা খাদের মধ্যে অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের সংগে একরকমের জলজ শিকারী উদ্ভিদ পেয়েছিলাম। উদ্ভিদগুলো ইউট্রিকুলেরিয়া জাতীয়। দেখতে সাধারণ জল-ঝাঁঝির মত, কিন্তু রংটা ফিকে সবুজ

জলজ শিকারী উদ্ভিদ—অ্যালড্রোভাণ্ডা

শান্তিনিকেতনের কাছে কোপাই নদীর দিকে যাবার সময় মনে হলো—বালির উপর এদিকে ওদিকে যেন পানের পিক পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি, একরকমের ছোট ছোট গাছ। দেখতে অনেকটা ছোট্ট টোকাপানার মত। ধারগুলো টকটকে লাল। এজন্যেই দূর থেকে পানের পিক বলে মনে হয়। পাতার চার-দিকে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়া। এরা কীট-পতঙ্গ শিকার ক'রে শরীর পোষণ করে। গাছগুলো ড্রসেরা জাতীয়। অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করবার পর একটা পাতার উপর ছোট্ট একটা পোকা দেখতে পেলাম।

পোকাটার পিছনের দিকটা শোঁয়ায় জড়িয়ে যাওয়ায় সে সেগুলোর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে চেষ্টা

এবং পাতাগুলো খুব সরু। ডাঁটার প্রত্যেকটা গাঁটের কাছ থেকে অনেকগুলো করে ছোট ছোট, অর্ধ গোলাকৃতি পেটিকা জন্মে থাকে। এই পেটিকাগুলোই শিকার ধরবার যন্ত্র। জলজ কীটাণুগুলোকে পেটিকায় আবদ্ধ করে উদরসাৎ করে থাকে। নিম্নশক্তির বাইনোকুলার মাইক্রস্কোপের তলায় রেখে এদের শিকার কৌশল যা' প্রত্যক্ষ করেছি তা, খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

তোমরা ইচ্ছা করলে অনায়াসে খাল-বিল থেকে এই শিকারী উদ্ভিদ সংগ্রহ করে ঘরে বসে, মাইক্রস্কোপের অভাবে অন্ততঃ—ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়েও তাদের শিকার কৌশল প্রত্যক্ষ করতে পার।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

পশুপক্ষীর আত্মগোপন কৌশল

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

পাড়াগেঁয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছি। পথের ধারেই প্রকাণ্ড একটা পুরনো আমগাছ। গাছের বেড়টা ৮।৯ হাতের কম হবে না। ৯।১০ হাত উপরে খুব মোটা একটা হেলানো ডাল থেকে রাঙ্গা ফুলের ছড়া ঝুলছে। ফুলগুলো এতই সুদৃশ্য যে পাড়বার লোভ সংবরণ করা দুষ্কর। খানিকটা উঠতে পারলেই ফুলগুলো ছিঁড়ে আনা যায়। বেশ কিছুটা মেহন্নৎ করে গাছটার উপরে উঠে গেলাম। একছড়া ফুল ছিঁড়েছি, আর একটা ছিঁড়তে যাব—হঠাৎ যেন কানে গেল—হিস্ হিস্, ফোঁস ফোঁস শব্দ। তবে কি সাপ—রান্নার ঝোপের ভেতর আত্মগোপন করে আছে! ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছি। থম্‌কে দাঁড়ালাম। কই—কোথাও তো কিছু দেখছি না! শোনা গেছে—পুরনো গাছের কোটরে বা ফাটলে অনেক সময় বিষাক্ত সাপ আস্তানা গেড়ে থাকে, পাখির ডিম খাবার লোভে। কিন্তু আর তো শব্দ শোনা যায় না। অহেতুক মানসিক ভীতি—মনকে প্রবোধ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়বার উদ্যোগ করছি। আবার সেই ফোঁস ফোঁস শব্দ। পাশ ফিরতেই দেখি—ডালটার সন্ধিস্থলে গাছটার গা ঘেঁসে বসে আছে—মস্ত বড় একটা হুতুম প্যাঁচা। মস্ত বড় হলেও সেটা যে বাচ্চা, দেখেই বোঝা গেল। অন্ধকারে বিড়ালের চোখ দুটো যেমন করে জ্বলে সেরকম ড্যাব্‌ড্যাবে চোখ দুটো দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। বাঘনখের মত বাঁকানো ঠোঁটটা যেন পিতল দিয়ে মোড়া। হাঁড়িপানা মুখখানার দু-পাশে বিড়ালের কানের মত খাড়া খাড়া দুটো ঝুটি। অদ্ভুত চেহারা। দেখলে হাসিও পায় ভয়ও লাগে। এতবড় পাখিটা গাছের গায়ের সঙ্গে যেন বেমালুম মিশে আছে—এমনই রঙের মিল! একটু দূর থেকে মনে হয় যেন ওটা গাছেরই একটা বর্ধিত অংশ। আমাকে নড়াচড়া করতে দেখে ফোঁস ফোঁস করে ভয় দেখাচ্ছিল। ধরবার উপক্রম করতেই নীচের দিকে উড়ে গেল। ভাল উড়তে শেখেনি। কতকগুলো শুকনো ডালপালা গাছটার কিছু দূরে স্তূপাকারে পড়েছিল। উড়ে গিয়ে প্যাঁচাটা সেই ডালপালার মধ্যেই পড়লো। গাছ থেকে নেমে পাখিটাকে ধরবার জন্যে ডালপালার স্তূপটার কাছে গেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার—প্যাঁচাটার কোন হদিসই পাওয়া গেল না। তবে কি অলক্ষ্যে অন্য কোথাও উড়ে গেল? ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এসে গন্তব্য স্থানে চলেছি। কাকের কলরবে পিছন ফিরে চেয়ে দেখি—সেই ডালপালার স্তূপটার আশেপাশে গোটা চার পাঁচেক কাক উড়ে এসে সমস্বরে মহা চেঁচামেচি সুরু করে দিয়েছে। ব্যাপার কি? আবার

প্যাঁচাটা ডালপালার মধ্যে বসে আছে

ফিরে গিয়ে দেখি—ডালপালার একপাশে প্যাঁচাটা সেই ড্যাব্‌ড্যাবে চোখ মেলে চুপটি করে বসে আছে। ডালপালার সঙ্গে এমন আশ্চর্য মিল যে, সহজে নজরেই পড়ে না। ছবিখানা দেখে ব্যাপারটার খানিকটা আঁচ করতে পারবে।

কেন এমন হয়, বলতে পার? মানুষকেই মানুষ ধোঁকা দেবার জন্যে কত রকম লুকোচুরি, প্রতারণা, আত্মগোপন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাবার জন্যে মানুষ যে কতরকম লুকোচুরি এবং আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন করেছিল সেকথা বোধ হয় তোমাদের অজানা নেই। অবশ্য মানুষের কথা আলাদা, কারণ তারা বুদ্ধিবলে অনেক কিছু করতে পারে এবং অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। পশুপক্ষীরা

কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই বিশেষ বিশেষ আত্মগোপন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য তাদের বংশানুক্রমিক। জীবজগতের সর্বক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই আছে। উদ্ভিদ জগতেও এর ব্যতিক্রম নেই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পরস্পরের মধ্যে খাদ্যখাদক সম্বন্ধটাই প্রবল। প্রত্যেকেরই পদে পদে শত্রু। কাজেই আত্মরক্ষার জন্যে প্রত্যেককেই সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। প্রবলের সঙ্গে দুর্বলের সামনাসামনি লড়াই দুর্বলের পক্ষে মারাত্মক। কাজেই আত্মরক্ষার তাগিদে শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে দুর্বলের পক্ষে লুকোচুরি, প্রতারণা বা আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন করাই সহজ এবং স্বাভাবিক। এর ফলেই 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বা 'যোগ্যতমের উর্ধ্বর্তনে' বিশেষ বিশেষ প্রাণী আত্মরক্ষামূলক বিশেষ বিশেষ কৌশলের অধিকারী হয়েছে। হুতুম প্যাঁচার ব্যাপারটাও এরকম একটা আত্মরক্ষামূলক কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

কেবল হুতুম প্যাঁচাই নয়, বিভিন্ন জাতের পশুপক্ষী আরও অদ্ভুত রকমের আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। অস্ট্রেলিয়ায় টনি ফ্রগমাউথ নামে এক-

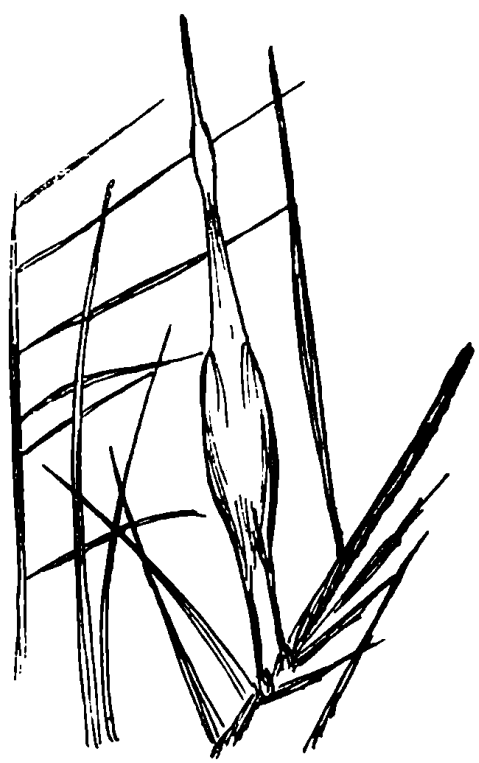

নলখাগড়ার মধ্যে বকটা আত্মগোপন করে আছে

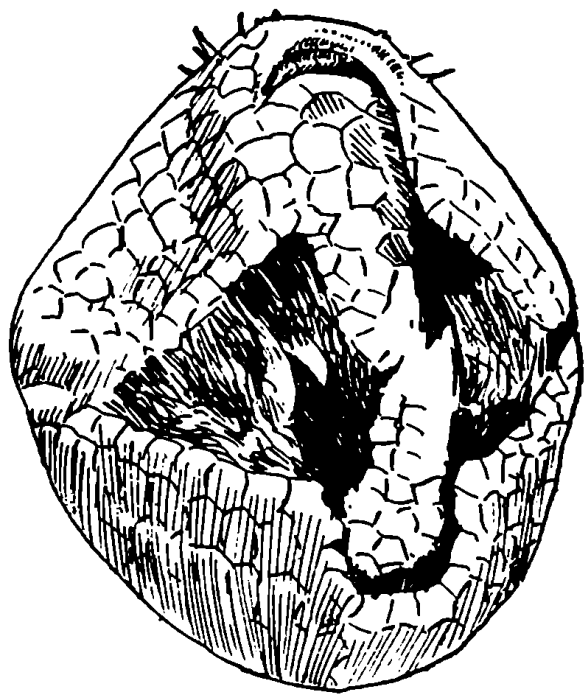

আর্মাডিলোর আত্মগোপন কৌশল

রকম পাখি দেখা যায়। এরা গাছের মোটা ডালের উপর পরিষ্কার জায়গায় বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে। ডিমে তা' দেবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই উন্মুক্ত বাসাতেই বসে থাকতে হয়। কোন রকম ভয়ের কারণ উপস্থিত হলেই গলাটাকে সামনের দিকে প্রসারিত ক'রে একেবারে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। পালকের রঙ এবং অবস্থান কৌশলে সেটাকে তখন গাছেরই একটা অংশ, মৃত কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার নাইটজার নামে একরকম পাখিও ভয় পেলে অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করে। তবে তাদের বসবার কায়দা ভিন্ন রকমের। আমাদের দেশের ফিঙে, টুনটুনি, তালচোঁচ, ডাহুক প্রভৃতি পাখিরাও আত্মগোপনের জন্যে নানা রকমের কৌশলের আশ্রয়গ্রহণ করে থাকে। ভয় পেলে এক জাতের বক গলাটাকে উঁচুদিকে প্রসারিত করে আশেপাশে নল-খাগড়ার সঙ্গে বেমালুম মিশে যাবার চেষ্টা করে। ছবিখানা দেখলেই অবস্থাটা বুঝতে পারবে। আমাদের দেশের কোঁচবক, কালীবকেরাও অনেক সময় শিকার ধরবার আশায় আশেপাশের ঘাসপাতার সঙ্গে গায়ের রঙের সামঞ্জস্যে আত্মগোপন করে অসীম ধৈর্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে।

কতকটা গোসাপের মত দেখতে গায়ে আঁশওয়ালা ম্যানিস্ নামে বাদামী রঙের একরকম রাত্রিচর জানোয়ার

অদ্ভুত উপায়ে আত্মগোপন করে থাকে। দিনের বেলায় এরা গাছের উপর বিশ্রাম করে। পেছনের পায়ের ধারালো নখ দিয়ে গাছের কাণ্ডটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সামনের পা-দুটো মুড়ে শরীরটাকে সোজা রেখে গাছের ডালের মত পাশের দিকে প্রসারিত করে দেয়। লম্বা লেজটাকে গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে শরীরের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখে। এ অবস্থায় সেই ঘুমন্ত প্রাণীটাকে গাছের একটা শুকনো ভাঙা ডাল বলেই মনে হয়।

আর্মাডিলো নামে একরকম জানোয়ারের কথা তোমরা শুনে থাকবে। জানোয়ারটা কতকটা ম্যানিসের মতই দেখতে; কিন্তু গায়ে আঁশ নেই। পিঠের উপর ঢালের মত একটা শক্ত আবরণী আছে! আবরণীটাকে ভাঁজ করা যায়। কোন কারণে ভয় পেলে আর্মাডিলো শরীরটাকে গুটিয়ে ফেলে এবং ঢালের মত আবরণীটাকে মুড়ে একটা পুটুলির মত হয়ে যায়। ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

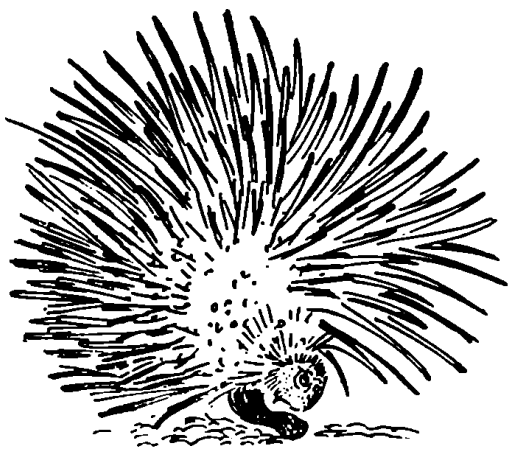

শরীরটাকে বলের মতো গুটিয়ে সজারু আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করেছে

এ অবস্থায় সেটাকে কোন জানোয়ার বলে চেনাই যায় না। কচ্ছপের দৈহিক গঠন ভিন্ন রকমের হলেও তাদের আত্মরক্ষার কৌশলও অনেকটা এ-ধরনের। বিশেষ করে আমাদের দেশের সুঁধি-কচ্ছপের আত্মগোপন কৌশলকে এদের চেয়ে অনেক নিখুঁত বলা যেতে পারে। কারণ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরে নিয়ে সুঁধি-কচ্ছপ যখন খোলাটার মুখ বন্ধ করে দেয় তখন তাকে কোন জীবন্ত প্রাণী বলেই মনে হয় না।

আমাদের জঙ্গলে সজারু নামে একপ্রকার অদ্ভুত জানোয়ার দেখা যায়। এদের সর্বশরীর কাঁটায় আবৃত। শত্রুর আক্রমণে পালাবার পথ না পেলে শরীরটাকে গুটিয়ে বলের আকার ধারণ করে। কাঁটাগুলো তখন কদম ফুলের মত সেই পিণ্ডাকার দেহটার চারদিকে খাড়া খাড়া হয়ে বেরিয়ে থাকে। এই অদ্ভুত আকৃতি যেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় তেমনই আবার শত্রুর মনে ভীতির উদ্রেক করে।

আত্মগোপনকারী গেছো-টিকটিকি, গিরগিটি, গোসাপ হয়তো তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। অবস্থান ক্ষেত্রের সঙ্গে এদের গায়ের রঙের এমন অদ্ভুত মিল যে, এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকলে সহজে কারুর নজরেই পড়ে না।

কীটপতঙ্গের লুকোচুরির কথা তোমাদের পূর্বেই বলেছি। তাছাড়া সাপ, ব্যাঙ, মাছ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের প্রাণীদের মধ্যে যে কত রকমের আত্মগোপনের কৌশল প্রচলিত আছে তা বলে শেষ করা যায় না। তোমরা এগুলো নিজের চোখে দেখবার চেষ্টা করো। দেখবে আরও কত অদ্ভুত ব্যাপার তোমাদের নজরে পড়বে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

আগামী সংখ্যায় দিল্লী থেকে বিশেষ রচনা লিখে পাঠাবেন

সায়ান্স রিপোর্টার পত্রিকার সহ-সম্পাদক

শ্রীবিমান বসু

ভারতের প্রথম দূর সঞ্চার উপগ্রহ ঃ অ্যাপ্‌ল

অদৃশ্য জীব-জগতের বিস্ময়

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অতিকায় জীবজন্তু থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত এই বিশাল জীবজগতের অনেক কিছুই আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। তার পরেই আমাদের দৃষ্টিশক্তি অচল। এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল—দৃশ্যমান এই জীব-জগতের বাইরে আর কোন জীবের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিউয়েনহোয়েক মাইক্রস্কোপ নামে এমন এক অদ্ভুত যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যার ভিতর দিয়ে অতি সূক্ষ্ম জিনিসকে বহুগুণ বড় করে দেখা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে এমন এক অদৃশ্য জীব-জগতের সন্ধান পাওয়া গেল যাদের চেহারা এবং আচার-ব্যবহার দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই অদৃশ্য জীব-জগতে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর—বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত অসংখ্য জীবের অস্তিত্ব রয়েছে। যেখান থেকে এই অদৃশ্য জীব-জগতের আরম্ভ সেখানকার কথাই আজ তোমাদিগকে বলব। এরাই হলো অদৃশ্য জগতের অতিকায় জীব। এদের আমরা কীটাণু নামে অভিহিত করব। এদের মধ্যে অ্যামিবা, প্রোটোজোয়া প্রভৃতির নাম বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। কিন্তু কখনও চোখে দেখেছ কি? না দেখে থাকলেও একদিন দেখবার সুযোগ পাবেই। এখন এদের কথা মোটামুটি জেনে রাখলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার যথেষ্ট সুবিধা হবে। এজন্যেই কীটাণু সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

গুটি বাঁধবার কৌশল প্রত্যক্ষ করবার জন্যে শোঁয়া-পোকা পুষতে হয়েছিল। তোমরা জান বোধ হয়, শোঁয়াপোকা হচ্ছে প্রজাপতির বাচ্চা। এই বাচ্চাগুলো গাছের পাতা খেয়েই বড় হয়। কাজেই ছোট্ট একটা টবের গাছে কতকগুলো শোঁয়াপোকা ছেড়ে দিয়ে টবটাকে জলভরা বড় একটা এনামেলের পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিলাম। জল দিয়ে টবটাকে ঘিরে রাখবার উদ্দেশ্য হলো—পোকাগুলো জল ডিঙিয়ে পালাতে পারবে না আর গাছটাও থাকবে সতেজ। দিন দুই পরে দেখি, জলের উপর পাতলা একটা সর পড়েছে, আর কয়েকটা শোঁয়া পোকা সারবেঁধে সেই সরের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। পরীক্ষাগারের আবদ্ধ পরিবেশ বোধ হয় ওদের সহ্য হচ্ছিল না; সেজন্যেই পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পরীক্ষাগারের টেবিলের উপর একই সময়ে রাখা আরও একপাত্র জল তো যেমন ছিল তেমনই আছে! তার উপরে তো সর পড়েনি! একটু সর তুলে নিয়ে মাইক্রস্কোপের নীচে রেখে দেখা গেল—অদ্ভুত কাণ্ড! শসা-বিচির মত চেপ্টা, দু'মুখ সূচালো কতকগুলো অদ্ভুত প্রাণী ইতস্তত ছুটোছুটি করছে। শরীরটা অতি পাতলা একটা খোসার মত। সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। ভিতরের সব কিছু দেখা যায়। শরীরের চতুর্দিকে অতি সূক্ষ্ম নমনীয় কতগুলো শোঁয়া আছে। সেগুলোকে অতি দ্রুত আন্দোলিত করেই এরা জলের মধ্যে ছুটোছুটি করে। এদের সাধারণ নাম হচ্ছে—প্যারামিসিয়াম

এনামেলের পাত্রটার তলা থেকে এবার ড্রপারে করে খানিকটা জল তুলে এনে মাইক্রস্কোপের তলায় রেখে দেখলাম—আরও অদ্ভুত দৃশ্য! এতে প্যারামিসিয়াম দেখা গেল না বটে, কিন্তু অন্য একরকমের অদ্ভুত প্রাণী দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। নদীতে বয়া ভাসতে দেখেছ তো। বয়াগুলো জলের তলায় নোঙরের সঙ্গে লম্বা শিকল দিয়ে যেমন করে বাঁধা থাকে এই প্রাণী-গুলোও যেন সেরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি বয়ার মত লম্বা সূতা দিয়ে বাঁধা। তবে আকৃতিটা ঠিক বয়ার মত নয়। বিজলী-বাতির ঘণ্টাকৃতি সুদৃশ্য শেডের মত দেখতে। জলের মধ্যে শালুক-ডাঁটার ডগায় যেমন ফুল ফুটে থাকে এগুলোও দেখতে অনেকটা সেই রকম। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়—প্রত্যেকটা শেডের কাণা যেন বায়ু-বেগে ঘুরছে। তাছাড়া আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ডাঁটা বা সূতায় বাঁধা শেডগুলো একই স্থানে নিশ্চলভাবে থাকে না। সূতা-বাঁধা অবস্থায় যতদূর ঘোরা-ফেরা সম্ভব তারই মধ্যে হেলেদুলে বেড়ায় এবং কিছুক্ষণ পর পর বাঁধা সুতাটা অকস্মাৎ স্প্রিঙের মত গুটিয়ে গিয়ে পদার্থটা জলের নীচে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। এই প্রাণীগুলোকে বলা হয়—ভর্টিসেলা। শেডের মত পদার্থটার কাণার চারদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলো শোঁয়া সাজানো আছে। ওই শোঁয়াগুলোকে অতি দ্রুতগতিতে পর পর আন্দোলিত করে এরা জলের মধ্যে স্রোত

উৎপন্ন করে। সেই স্রোতের টানে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু-সমূহ তাদের মুখে এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখটাকে সংকুচিত করে জলের নীচে চলে যায়। এই হচ্ছে ওদের আহার সংগ্রহের প্রণালী।

এই অদ্ভুত প্রাণীগুলো ছাড়াও এখানে সেখানে বিন্দু বিন্দু জেলীর মত আরও কতকগুলো অদ্ভুত প্রাণী দেখা গেল। প্রথমে দেখে ওগুলোকে কোন প্রাণী বলেই মনে হয় নি—কারণ এখানে ওখানে এক একটা নিশ্চল তারকা-চিহ্নের মত পড়েছিল! কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো—তারকা-চিহ্নগুলো যেন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। যতই সময় যেতে লাগল তাদের আকৃতি ততই দ্রুত পরিবর্তিত হতে সুরু করল। জেলীর মত পদার্থটার একদিক দিয়ে নতুন ডালপালা গজিয়ে উঠে আবার অপর দিকেরটা মিলিয়ে যায়। এভাবেই তারা আহার অন্বেষণে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছিল। তোমরা অ্যামিবার নাম শুনেছ নিশ্চয়। এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোর নামই অ্যামিবা।

এক ফোঁটা জলের মধ্যে অদৃশ্য-জগতের এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোকে দেখে স্বভাবতই মনে হলো—এরা এলো কোত্থেকে? কারণ অন্য পাত্রের জলে এরূপ কোন কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় নি। অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার ফলে দেখা গেল—গাছের উপরের শেঁায়াপোকার পরিত্যক্ত মল জলে প'ড়ে তা-থেকেই এই প্রাণীগুলোর উৎপত্তি হয়েছে।

এই ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে ডোবার জল থেকে শ্যাওলা জাতীয় একটুকরো পাতা এনে জল সমেত মাইক্রস্কোপের তলায় রেখে দেখতে লাগলাম। প্রথমটায় গোল, লম্বা এবং একদিকে বাঁকানো ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন জাতের কয়েকটা প্যারামিসিয়াম ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কিছুক্ষণ বাদেই দেখি—ছোট্ট পাতাটার তলার দিক থেকে মুগুরের মত একটা পদার্থ ক্রমশ লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকটা লম্বা হয়ে সেটার মুগুরের মত মাথাটা হঠাৎ গ্রামোফোনের চোঙের মত হাঁ করে খুলে গেল। পরিবর্ধিত অবস্থায় সেটাকে একটা ভীষণ-দর্শন জীব বলেই মনে হবে। কিছুক্ষণ এভাবে হাঁ করে থেকে দেহটাকে সংকুচিত করে আবার পাতার নীচে চলে গেল। কেবল একটাই নয়—ইতিমধ্যে পাতাটার অন্যদিক থেকে ওরকমের আরও তিন-চারটা প্রাণী বেরিয়ে এসে হাঁ করে ছিল। এগুলোকে বলে—স্টেন্টর। বিভিন্ন আকৃতির ছোট বড় নানারকমের স্টেন্টর দেখা যায়। মুখটাকে গ্রামোফোনের চোঙের মত বিস্তৃত করে এরা খাবার সংগ্রহ করে। কোন কিছু মুখে পড়লেই দেহটাকে সংকুচিত করে ডেলার মত হয়ে যায়। জিনিসটা উদরস্থ হলেই আবার নতুন শিকারের সন্ধানে মুখখানাকে হাঁ করে রাখে। এদেরও গোলাকার মুখটার চারধারে কতকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শেঁায়া আছে। এই শেঁায়াগুলোকে পর পর অতি দ্রুতগতিতে আন্দোলিত করে জলে স্রোত উৎপন্ন করে। সেই স্রোতের টানে অতি ক্ষুদ্র কীটাণুসমূহ এদের বিশাল গহ্বরের মত মুখে এসে পড়ে।

ময়লা জল থেকে আর একরকমের শেওলা এনে মাইক্রস্কোপের তলায় রাখলাম। দেখা গেল—এতে ভর্টিসেলা রয়েছে কয়েক রকমের। কোনটা খেলনা বেলুনের মত, কোনটা অর্ধ গোলাকার চায়ের পেয়ালার মত, আবার কোনটা বা বিজলী বাতির শেডের মত। এর মধ্যে আর একটা নতুন রকমের প্রাণী চোখে পড়ল। প্রাণীটা দেখতে অনেকটা এলাচের মত। বোঁটার দিকটা পাতার গায়ে আটকানো। মুখের দিকটা প্রসারিত করে তার ভিতর থেকে বের করল অদ্ভুত একটা যন্ত্র। যন্ত্রটার সামনের দিকে এক জোড়া চাকা ঘুরছে। চাকা-দুটো যে সত্যসত্যই ঘুরছে তা নয়—চাকার চারধারের সূক্ষ্ম শেঁায়া-গুলোর পর পর আন্দোলনের ফলেই এরূপ দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে। এদের শরীরের ভিতরের দিকটায় নজর দিলে দেখা যায় যেন একটা এঞ্জিন চলছে—তার পিস্টন রডটা অনবরত ওঠা-নামা করছে। এই প্রাণীগুলোর নাম হচ্ছে—রটিফার বা চক্র-কীটাণু। এছাড়া ওই ময়লা জলটুকুর মধ্যে ছবিতে আঁকা রশ্মিবিকিরণকারী সূর্যের মত আর এক রকমের কতগুলো প্রাণী দেখা গেল। এগুলো প্রায় নিশ্চল। অতি মন্থরগতিতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরে যায়। পদার্থটা দেখতে সম্পূর্ণ গোল—চতুর্দিক থেকে লম্বা লম্বা কাঁটার মত জিনিস বেরিয়ে আছে। এগুলোকে বলা হয়—রেডিওল্যারিয়া। এরূপে ক্রমে ক্রমে আরও যে কত রকমের অদ্ভুত আকৃতির কীটাণুর দেখা পাওয়া গেল এখানে তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয় নিজের চোখে দেখবার চেষ্টা করো। মাইক্রস্কোপের অভাবে অন্তত শক্তিশালী রিডিং-গ্লাস দিয়ে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করতে পার। যে-সব অদৃশ্য কীটাণুর কথা বললাম—রিডিং-গ্লাস দিয়ে অবশ্য তাদের দেখতে পাবে না; তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ, লতা-পাতা, ফুল-ফলের সূক্ষ্মাংশসমূহ পরীক্ষা করে অনেক রহস্যের বিষয় জানতে পারবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

প্রাচীন যুগের অতিকায় ঘণ্টা

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ঘণ্টা জিনিসটা কি, সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। প্রাচীন আমলের এই অদ্ভুত শব্দোৎপাদক যন্ত্রটি আজও প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। পূজা-পার্বণে ঘণ্টাধ্বনি অনুষ্ঠানের আঙ্গিক হিসাবে আজও অপরিহার্য। তবে প্রাচীন আমলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন বিশাল আকৃতির ঘণ্টা তৈরীর রেওয়াজ ছিল আজকাল সেটা মোটেই নেই। বর্তমানকালে সঙ্কেত জ্ঞাপন বা সময় নির্দেশের উদ্দেশ্যে প্রাচীন আমলের ঘণ্টার কিছু কিছু প্রচলন থাকলেও একমাত্র ফায়ারব্রিগেডের গাড়িতেই বোধহয় সেই সনাতন ঘণ্টার কার্যকরী ব্যবহার দেখা যায়।

যাহোক, কোন্ দেশে কে প্রথম ঘণ্টার উদ্ভাবন করেছিলেন, সে কথা জানা নেই; তবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে কোন কোন দেশে ঘণ্টার প্রচলন ছিল, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিশরের প্রাচীন অধিবাসীরা অসিরিস দেবের উৎসবে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সুরু করতো। প্রাচীন গ্রীক পুরোহিতেরাও উৎসবাদিতে ঘণ্টাধ্বনি করতেন। তাছাড়া গ্রীক সৈন্যদের দুর্গ ও ছাউনিতে ঘণ্টার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রোমানরা ঘণ্টাধ্বনি করে সূর্যোদয়ের সময় সকলকে জানিয়ে দিত। ইংল্যাণ্ডে নরম্যান রাজাদের রাজত্বকালে রাত্রির একটা নির্দিষ্ট সময়ে আলো এবং আগুন নিবিয়ে ফেলবার জন্যে ঘণ্টাধ্বনি করে সঙ্কেত দেওয়া হতো। এরই নাম ছিল কারফিউ বেল।

খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে উপাসনাকারীদের ভজনালয়ে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাবার জন্যে ঘণ্টার ব্যবহার সুরু হয়। ৬৮০ খৃস্টাব্দ থেকেই বোধহয় ইংল্যাণ্ডে ঘণ্টার প্রচলন হয়। অবশ্য সেগুলো ছিল হাতে-বাজানো ছোট ছোট ঘণ্টা; কিন্তু কখন থেকে অতিকায় ঘণ্টা তৈরীর রেওয়াজ সুরু হয়, সেকথা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতেই খুব সম্ভব বিরাট আকৃতির ঘণ্টার প্রচলন খুব বেশী হয়েছিল। ৪ ভাগ তামা ও একভাগ টিনের মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কর ধাতু দিয়েই ঘণ্টা তৈরী হতো। প্রত্যেক ঘণ্টার আকৃতিই হতো চূড়াসমেত মন্দিরের গম্বুজের মত। ভিতরের দিক বা বাইরের দিক থেকে ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা থাকতো।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ঘণ্টাটি আছে রাশিয়ার মস্কো শহরে। এই অতিকায় ঘণ্টাটির নাম হচ্ছে জার কলোকল। এই বিরাট ঘণ্টাটি নাকি ১৬৫৩ খৃস্টাব্দে ঢালাই করা হয়। ১৭৭৩ সালে একটা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে ঝুলানো অবস্থা থেকে ঘণ্টাটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার ফলে সেটা ফেটে অকেজো হয়ে যায়। অনেককাল এভাবে মাটির উপর পড়ে থাকবার পর ১৮৩৭ সালে এই ঘণ্টার নীচের মাটি খুঁড়ে একটা গির্জা তৈরী করা হয় এবং বিরাট ঘণ্টাটি সেই ভূগর্ভস্থ গীর্জার গম্বুজ হিসাবে থেকে যায়। মস্কোতে অবশ্য ব্যবহারোপযোগী আরও একটা অতিকায় ঘণ্টা আছে। সেটা ঢালাই করা হয়েছিল ১৮১৭ খৃস্টাব্দে। এটা পুরাতন অকেজো ঘণ্টার কাছেই উঁচু একটা মঞ্চে ঝুলানো আছে। এটাকে বলা হয়—নিউ বেল। এটার ওজন ১২ টন। ব্রহ্মদেশের মিঙ্গুনেও ১২৫ টন ওজনের একটা অতিকায় ঘণ্টা আছে। চীনের পিকিন শহরেও একটা বড় ঘণ্টা আছে তবে তার ওজন অনেক কম—৫৩ টন মাত্র। তবে বৃহত্তর ঘণ্টা রাশিয়াতেই বেশী দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডের গ্রেট পল নামে ঘণ্টাটিও কম নয়! এই ঘণ্টাটির ওজন ১৭ টন। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে এই ঘণ্টাটি ঢালাই করে সেণ্ট পল ক্যাথেড্রেলে ঝুলানো হয়। তাছাড়া লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্ট ভবনের ক্লক টাওয়ারের বিগ বেন নামক ঘণ্টাটিও বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৮৫৬ সালে বিগ বেন ঢালাই করা হয়। প্রথমে এর ওজন ছিল ১৪ টন; কিন্তু ফাটল ধরার ফলে একে পুনরায় ঢালাই করা হয়। তখন ২½ টন মাল কম হয়। কিছুকাল পরে এতে আবার ফাটল ধরে—সে অংশটুকু কেটে দেওয়া হয়। এই ঘণ্টার হাতুড়ির ওজন হচ্ছে ৬ হন্দর। এ ছাড়া ইংল্যাণ্ডে আরও কয়েকটি ঘণ্টা আছে। তাদের মধ্যে এক্সেটরে ক্যাথড্রেলের ঘণ্টাটির ওজন ১১ টন ১২ হন্দর এবং গ্রেট টম নামে পরিচিত অক্সফোর্ডের ঘণ্টাটির ওজন ৭ টন ১২ হন্দর।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

সত্য কথা বলানোর ঔষধ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কথাটা শুনে তোমরা হয়তো একটু বিস্মিতই হবে—ওষুধ দিয়ে আবার সত্য কথা বলানো যায় নাকি? কিন্তু সত্যি সত্যিই এমন ওষুধ আছে যার প্রভাবে মানুষ সত্য গোপন করতে পারে না। ভয় দেখিয়ে সত্য কথা বলানো, আর ওষুধ প্রয়োগে সত্যকথা বলানোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ উভয়েরই ক্রিয়া হয় মস্তিষ্কে। সত্য গোপন করতে গেলে বিশেষভাবে মস্তিষ্ক চালনা করতে হয়। এই ওষুধ প্রয়োগে মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও, অন্ততঃ আংশিকভাবে সক্রিয় থাকে। এই আংশিক সচেতনতার ফলেই অপরাধী যতটুকু সম্ভব, দৃষ্ট ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দিতে পারে; কিন্তু বিকৃত রূপ দিয়ে সাজিয়ে বলতে পারে না।

অনেক কাল থেকেই স্কোপোলামিন নামে একটা ওষুধ প্রচলিত আছে। প্রসব-বেদনায় এই ওষুধ ইনজেকশন করা হয়। অনেকদিন আগে কোন এক রোগীর উপর স্কোপোলামিন প্রয়োগের ফলে আকস্মিকভাবেই জানা যায় যে, এতে মস্তিষ্ক সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয় না; খানিকটা সচেতন থাকে। এ থেকেই স্কোপোলামিন প্রয়োগ করে অপরাধীকে দিয়ে সত্য কথা বলানো যায় কিনা—তার পরীক্ষা চলতে থাকে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলেও, ওষুধ প্রয়োগে স্বীকারোক্তি আইনতঃ গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয় নি। আইনতঃ গ্রাহ্য না হলেও অপরাধীর কাছ থেকে এমন সব তথ্য সংগৃহীত হতে পারে যাতে অপরাধ প্রমাণ করতে তেমন কোনও বেগ পেতে হয় না। কাজেই এ ধরনের আরও শক্তিশালী ওষুধ উদ্ভাবনের চেষ্টা চলতে থাকে। ফলে, সম্প্রতি স্কোপোলামিনের চেয়ে অধিকতর কার্যকরী সোডিয়াম পেন্‌টোথ্যাল ও সোডিয়াম অ্যামিটল নামে দুটি ওষুধের কথা জানা গেছে। এর মধ্যে সোডিয়াম পেন্‌টোথ্যালের ব্যবহারই বেশী। এটাই সত্যকথা বলানোর ওষুধ নামে পরিচিত। বিশেষ মাত্রায় এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

এবারেও বেরোচ্ছে
দুর্ধর্ষ শারদ সঙ্কলন

যে বই নিয়ে
কাড়াকাড়ি পড়বেই

সূচ আলপিন

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচ, আলপিন, পেন্সিল, কাগজ, কলম প্রভৃতি জিনিস-গুলো আমাদের নিত্য প্রয়োজন। দামে সস্তা, এবং সহজ-লভ্য হওয়ায় আমরা এগুলোকে তুচ্ছ জিনিস বলেই মনে করি। একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে—যত তুচ্ছ মনে হয় আসলে কিন্তু ওগুলো তত তুচ্ছ নয়। এই তুচ্ছ জিনিস-গুলো তৈরী করতে কি বিরাট ব্যাপার—কি বিরাট কলকারখানার প্রয়োজন হয়, সে কথা শুনলে তোমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। সূচ একটা অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ পদার্থ, ছোট এক টুকরা ইস্পাতের তার মাত্র। সূচের মুখটা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে এসেছে আবার পিছনের দিকে ছোট্ট একটা চোখ। এই সূক্ষ্ম বস্তুটা কেমন ক'রে তৈরী হয়? হাতে ঘষে অনেক পরিশ্রমের ফলে এক আধটা সূচ তৈরী করা সম্ভব বটে; কিন্তু যে সূচ আজ-কাল আমরা ব্যবহার করি তার সবগুলোই নির্দিষ্ট মাপের, একই রকমের—যেমন মসৃণ, চকচকে তেমনই নিখুঁৎ। তাকে এত কম দামে কেমন ক'রে পাওয়া যায়—এ প্রশ্ন কি কখনও তোমাদের মনে জাগে নি? কেমন করে সূচ তৈরী হয়, কেমন করে কাগজ, কলম, কাচের দোয়াত, বাসন কোসন ও অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরী হয়—এসব কথা নিশ্চয়ই তোমাদের জানবার ইচ্ছা হয়। এসব বিষয় সম্পর্কে ক্রমশঃ তোমাদের কৌতূহল মিটাবার চেষ্টা করবো। এখন মোটামুটি ব্যাপারটা জেনে রাখলে, বড় হয়ে এ সম্বন্ধে খুটিনাটি বিস্তৃত বিবরণ নিজেরাই চেষ্টা করে জেনে নিতে পারবে। আজ তোমাদিগকে সূচ এবং আলপিন তৈরীর কথা বলছি ঃ—

সূচ অনেক রকমের হয়ে থাকে—একথা বোধ হয় তোমাদের অজানা নয়। সাধারণত দু'রকমের সূচের সঙ্গে তোমরা নিশ্চয়ই পরিচিত। সেলাইয়ের কলের সূচ আর সাধারণ সেলাই-ফোড়াই করবার সূচ। তাছাড়া মোজা, অথবা গেঞ্জি-কলের সূচও বোধহয় অনেকেই দেখেছ। সাধারণ সূচের পিছন দিকে যে ছিদ্র থাকে তাকে বলা হয় সূচের চোখ। ছোট্ট সূচের চোখে সূতা পরানো যে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন সে কথা তোমরা জান। এই চোখটাই হলো সূচের আসল জিনিস। সাধারণ সূচের চোখটা থাকে পিছনের দিকে, আর সেলাইয়ের সূচের চোখটা থাকে ডগায়। মোজা, গেঞ্জি বোনবার সূচগুলো কিন্তু আরও অদ্ভুত। এদের মুখটা ভোঁতা আর চোখটা থাকে সাধারণ সূচের মতই পিছনে। কিন্তু চোখটা এমন অদ্ভুত কায়দায় তৈরী যে, সূতা পরাবার কোন হাঙ্গামাই নেই। চোখটার একপাশে ফাঁক—সূতাটা আপনাআপনিই চোখের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং সংগে সংগে ফাঁকটাও বন্ধ হয়ে যায়।

যা হোক, সূচের পেছনে চোখ থাকাটাই ছিল বরাবরকার ব্যবস্থা। কিন্তু কলে সেলাই করবার জন্যে সূচের পিছনের এই চোখটাকে মাথায় আনতে হয়েছিল। সে এক অদ্ভুত ইতিহাস। সামান্য একটা সূচ, তার তুচ্ছ একটা চোখ। পিছন থেকে মাথার দিকে এই তুচ্ছ চোখটার স্থান পরিবর্তনের ইতিহাস অতীব বিস্ময়কর। সেলাই করতে হলে সূতা-পরানো সাধারণ একটা সূচকে কাপড়ের একদিক দিয়ে ফুঁড়ে অপর দিক দিয়ে বের করে নিতে হয়। কলের সাহায্যে এরূপ ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য। কাজেই অনেককাল ধরে বিভিন্ন লোকের চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তোষজনক সেলাইয়ের কলের উদ্ভাবন সম্ভব হয় নি। আমেরিকার এক ভদ্রলোক প্রায় সারাজীবন ধরেই সেলাই-কলের উন্নতি বিধানের জন্যে চেষ্টা করে আসছিলেন। কিন্তু সূচের এই পিছন দিকের ছিদ্রের জন্যে অন্যান্য লোকদের মত কিছুতেই তিনি সাফল্য লাভে সমর্থ হচ্ছিলেন না। এভাবে তাঁর প্রায় বিশ বছর কেটে গেল। একদিন তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। রেড্-ইণ্ডিয়ানরা বল্লম নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেছে। তিনি শুয়েই আছেন, উঠতে পারছেন না, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা বল্লমের ফলা তার প্রায় নাকের ডগার কাছে এসে গেছে—মুহূর্তের মধ্যেই তাঁকে গেঁথে ফেলবে। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও তিনি লক্ষ্য করলেন—বল্লমের ফলাটায় লম্বাটে গোছের একটা ছেঁদা। বল্লমের ডগায় ছেঁদা কেন?—ঘর্মাক্ত কলেবরে জেগে উঠে তিনি বিস্মিত হয়ে কেবল সে কথাই ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হলো—আচ্ছা, সূচের ছেঁদাটাকে যদি পিছন থেকে স্বপ্নে-দেখা বল্লমের ফলার মত মাথায় আনা যায় তবে তো সেলাই-কলের সমস্যাটা সহজেই মিটে যেতে পারে। হলোও তাই। সূচের পিছনের ছেঁদা মাথায় এনে তিনি সেলাই-কল তৈরীর সমস্যা অনায়াসেই সমাধান করে ফেললেন। তখন থেকেই প্রকৃত সেলাই-কলের উদ্ভব হলো।

যা হোক, এখন তোমাদিগকে সূচ তৈরীর কথা বলছি। প্রত্যেকটা সূচ কেমন মসৃণ, চকচকে, নিখুঁত—তা' নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। তোমরা শুনে বিস্মিত হবে যে, এরূপ সুদৃশ্য আকার ধারণ করতে এই তুচ্ছ বস্তুটাকে অন্ততঃ বিশ রকমের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আসতে হয়। বস্তুটা তুচ্ছ হলে কি হয়! এই তুচ্ছ বস্তুটা তৈরী করতেই এক একটা কারখানায় হাজার হাজার লোক রাতদিন কাজ করছে, অপূর্ব কৌশলী বিচিত্র যন্ত্রপাতি চলছে।

সূচ তৈরী হয় কি দিয়ে?—সূচ তৈরী হয় ইস্পাতের সূক্ষ্ম তার থেকে। বিলাতের শেফিল্ডের কারখানাগুলিতেই প্রধানতঃ এই ইস্পাতের তার উৎপাদিত হয়ে থাকে।

কেমন করে সূচ তৈরী করতে হয়?—অনেক তার এক সংগে কুণ্ডলী করা থাকে। দুটা সূচ লম্বায় যতটা হবে ঠিক ততটা লম্বা করে, তারের কুণ্ডলীটাকে প্রথমতঃ খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয়। খণ্ড করা প্রত্যেকটি টুকরোকে বলা হয় 'লেংথ্'। কুণ্ডলী থেকে কাটা হয় বলে 'লেংথ'-গুলো থাকে খানিকটা ধনুকের মত বাঁকানো। কাজেই প্রথমে দরকার—এই তারগুলোকে সোজা করা। অনেক-গুলো 'লেংথ' একত্রিত করে দুদিকে দুটা শক্ত আংটির বাঁধন দিয়ে বাণ্ডিল করা হয়। তারের বাণ্ডিলগুলিকে অতঃপর আগুনের চুল্লীতে পুড়িয়ে লাল করা হয়, তখন তারের টুকরা বা 'লেংথ'গুলো হয়ে যায় নরম। চুল্লী থেকে বার করবার পর সামান্য ঠাণ্ডা করে 'লেংথ'-গুলোকে লোহার মসৃণ টেবিলের উপর রাখা হয়। সেখানে 'স্মুদ ফাইল' নামক বক্র-পৃষ্ঠ এক প্রকার লৌহ যন্ত্রের সাহায্যে 'লেংথ'গুলো সম্পূর্ণরূপে সোজা না হওয়া পর্যন্ত ডলাই চলতে থাকে। প্রত্যেকটি সোজা তারের টুকরা থেকে দুটি করে সূচ তৈরী হবে। এদের বলা হয় 'ব্ল্যাংক্স'।

'ব্ল্যাংক্সে'র মুখগুলো কেমন করে তীক্ষ্ণ করা হয়?

অদ্ভুত কৌশলসম্পন্ন একপ্রকার শাণ-যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ব্ল্যাংক্সের মুখগুলো সরু ও তীক্ষ্ণ করে তোলা হয়। শাণ-চক্রটা ঘোরে রাবারে ঢাকা একটা চাকার মধ্যে। রাবারে ঢাকা চাকা ও শাণের চাকার মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক আছে। 'হপার' নামক এক প্রকার কৌশলী পাত্র থেকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ব্ল্যাংক্স্গুলো ওই ফাঁকের মধ্যে আপনা আপনি ঢুকে গিয়ে চাকার গায়ের রাবারের সংগে লেগে থাকে। চাকাটা ঘোরবার সময় শাণ-চক্রের ঘর্ষণে 'ব্ল্যাংকসে'র মুখ তীক্ষ্ণ এবং মসৃণ হয়ে যায়। ঘর্ষণের ফলে নির্গত অতিসূক্ষ্ম ইস্পাত-কণিকা ধূলার আকারে একটা নলের ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। ইস্পাতের এই সূক্ষ্ম চূর্ণগুলোকে বাইরে বের করে দেওয়া নেহাৎ প্রয়োজন। কারণ এগুলো কারখানার মধ্যে ছড়িয়ে গেলে নাক মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, কর্মীদের গুরুতররূপে স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে থাকে। শাণ-যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে

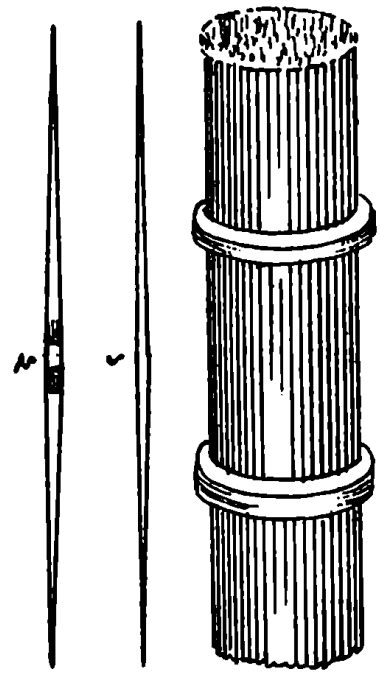

হাতে চালানো শাণে একাজ করা হতো। তখন এই মিহি লৌহচূর্ণ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে বহুলোক মারা যেত।

সূচের চোখ কেমন করে তৈরী হয়?

'ব্ল্যাংক্সে'র দু'দিকের মুখ সুতীক্ষ্ণ হওয়ার পর এমারির চাকার ঘর্ষণে সেগুলোকে পালিশ করা হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে এক একটা করে আপনা আপনি স্ট্যাম্পিং-মেশিনে চলে যায়। সেখানে 'ব্ল্যাংক্সে'র ঠিক মধ্যস্থলের খানিকটা চেপ্টা করে এবং যেখানে সূচের চোখ থাকে সেখানে দাগ কেটে দুদিকে একটু খাঁজের মত করা হয়। পরে এই দাগের উপরেই হ্যাণ্ড-প্রেস বা মেশিন-প্রেসের সাহায্যে ছিদ্র করা হয়। এরপরে 'ব্ল্যাংকসে'র দুদিকের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দু'গাছা সরু তার প্রবেশ করিয়ে দেয়। 'ফাইলার' নামক কর্মীরা দুগাছা তারে গাঁথা সারিবদ্ধ সূচগুলোর ছিদ্রের আশপাশ মসৃণ করে দেবার পর তারের মধ্যে গাঁথা সারিবদ্ধ সূচ-

গুলোকে সামনে ও পিছনে বাঁকাতে থাকে। ফলে দুটো চোখের মধ্যস্থল ভেঙে গিয়ে দু'সারি সূচের মালা সৃষ্টি হয়। তারে গাঁথা সূচের মালাগুলোকে অতঃপর 'ভাইস' নামক এক প্রকার যন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে দেয়। সেখান থেকে পালিশ হয়ে এবং ডগাগুলো নির্দিষ্ট আকৃতি নিয়ে বেরিয়ে আসে।

এভাবে সম্পূর্ণরূপে তৈরী সূচ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকী। তৈরী সূচগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ একটা পাত্রে রেখে চুল্লীতে পুড়িয়ে লাল করা হয়। তেল ভর্তি বৃহৎ পাত্রের মধ্যে হঠাৎ ডুবিয়ে দিয়ে সেগুলোকে ঠাণ্ডা করে। তেল থেকে তুলে নিয়ে আবার ধীরে ধীরে গরম করে পুনরায় ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা হয়। একে বলে 'টেম্পার' করা বা পান দেওয়া।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এরূপ 'টেম্পার' করার ফলে সূচগুলো কড়া হয়ে যায়। কিন্তু বার বার পোড়ানো এবং ঠাণ্ডা করবার ফলে সেগুলো হয়ে যায় কালো এবং খস্‌খসে। কাজেই আবার পালিশ করা দরকার। ক্যানভাসের মধ্যে নরম সাবান, এমারি-পাউডার এবং তেলের সংগে সূচগুলোকে রেখে রোলারের মত করে পাকিয়ে তোলা হয়। লোহার টেবিলের উপর স্থাপিত দু'খানা পুরু কাঠের ব্লকের মধ্যে এই ক্যানভাসের রোলারগুলোকে বসিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে সামনে পিছনে ডলাই করবার পর সূচগুলো বার করে খুব ভাল করে ধোলাই করা হয়।

এরপরে পালিশ-পাউডার মিশিয়ে আবার রোলারে ডলাই করবার পর বার্নিশ করে বিক্রয়ের জন্যে প্যাকেটে ভর্তি হতে চলে যায়।

আলপিন তৈরী হয় কেমন করে ?

আলপিন তৈরী হয় পিতলের সরু তার থেকে। তৈরী হবার পর সেগুলোকে টিন বা রাঙের কলাই করে দেওয়া হয়। 'ভার্ডিগ্রিজ' নামে একরকম বিষাক্ত পদার্থ পিতলের উপর জমে বলেই বিশেষ করে কলাই করা দরকার। ১৮৩৮ সাল অবধি বিলাতে হাতে করেই আলপিন তৈরী হতো। মাথাগুলো আলাদা তৈরী করে জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আজকাল সম্পূর্ণরূপে কলেই আলপিন তৈরী হয়। আমেরিকানরাই সর্বপ্রথম আলপিন তৈরীর যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

একটা যন্ত্রের সামনের দিকে প্রকাণ্ড একটা 'রিল' আছে। আলপিন তৈরী করবার তারগুলো এই রিলের গায়ে জড়ানো থাকে। তারটাকে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সোজা হয়ে আসতে হয়। সাঁড়াশির মত একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে তারের মুখটাকে টেনে ধরে সেই অবস্থায় 'স্ট্যাম্পিং' করে মাথাটা তৈরী হয় এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় তারটা ঠিক মাপ মত কেটে যায়। এই কর্তিত খণ্ডগুলোর ভোঁতা দিকটা একটা যন্ত্রের সাহায্যে সূচালো করা হয়।

স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারটা থেকে একটার পর একটা করে অতি দ্রুতগতিতে আলপিন তৈরী হতে থাকে। পিনের মুখটা তীক্ষ্ণ করা হয় চক্রাকার একপ্রকার উখার সাহায্যে। চক্রের মত এই যন্ত্রটা অতি দ্রুতবেগে ঘুরতে থাকে। যান্ত্রিক কৌশলেই আলপিনগুলো আপনা আপনি সামনে পিছনে যাতায়াত করে চাকার ঘর্ষণে সূচীমুখ হয়ে যায়। এ অবস্থায় পিনগুলো যখন বেরিয়ে আসে তখন থাকে হলুদে রঙের। হলুদে পিনগুলোকে ঘূর্ণায়মান পিঁপের মত একটা যন্ত্রের মধ্যে রেখে পরিষ্কার করা হয়।

তারপর সেগুলোকে রাং বা টিন চূর্ণ ও এসিডের সংগে মিশিয়ে লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করা হয়। টিনের কলাই হবার পর পিনগুলোকে যন্ত্র সহযোগে শুকিয়ে নেয়, তারপর পালিশ করে আলাদা এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের মধ্যে গেঁথে বিক্রয়ের জন্যে চালান দেওয়া হয়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অক্টোবর ১৯৪৮

কীটপতঙ্গের লুকোচুরি

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

উদরপূরণের জন্যে একজাতের প্রাণী অন্য জাতের প্রাণীকে হত্যা করে—একথা তোমাদের অজানা নয়। প্রবল দুর্বলকে, দুর্বল আবার তার চেয়ে দুর্বলকে উদরস্থ ক'রে জীবিকানির্বাহ করে। প্রাণিজগতে পরস্পরের মধ্যে একটা খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ রয়েছে ব'লে সর্বত্রই এ-রকমের হানাহানি চলতে দেখা যায়। এই হানাহানির মধ্য দিয়েই প্রাণীকে বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করে নিতে হয়। কেবল প্রবলের আক্রমণ থেকে জীবন বাঁচানোই নয়, শিকার সংগ্রহ ক'রে উদরপূরণের ব্যবস্থাও চাই। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই বিভিন্ন জাতের প্রাণী বিভিন্ন রকমের কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে। প্রাণীদের লুকোচুরির ব্যাপারটা এই আত্মরক্ষারই একটা বিশিষ্ট কৌশলমাত্র। কীট-পতঙ্গের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ লুকোচুরির কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়। যে দুর্বল লুকোচুরির আশ্রয়ে সে চায় শিকারীর নজর এড়িয়ে প্রাণ বাঁচাতে, আর শিকারী চায় লুকোচুরির আশ্রয়ে সহজে শিকারকে আয়ত্ত করতে। কয়েকটা দৃষ্টান্তের কথা বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

বহুরূপী নামে একজাতের প্রাণীর কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আলিপুরের বাগানেও অনেকে হয়তো এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে দেখে থাকবে। বহুরূপী ইচ্ছামত তার গায়ের রং বদলাতে পারে। যখন যেখানে থাকে তার আশেপাশের রঙের মত বহুরূপী তার গায়ের রং পরিবর্তন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে বসে থাকে। লতাপাতার মধ্যে অবস্থানকালে গায়ের রং হয় পাতার মত সবুজ। হয়তো চোখের সামনেই বসে আছে—অথচ সহজে তোমার নজরে পড়বে না। বিন্দুমাত্র নড়াচড়ার লক্ষণ নেই—ঠিক যেন মাটির গড়া একটা নির্জীব প্রাণী! চোখ দুটাকে কেবলমাত্র এদিক-ওদিক ঘুরতে দেখা যায়। চোখ ঘোরাবার কায়দাও অদ্ভুত। হয়তো একটা চোখে তোমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে—ইতিমধ্যে অপর চোখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আশেপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। এরা এমনভাবে বসে থাকে কেন—জান? শিকার ধরবার আশায়। পোকা-মাকড় শিকার ক'রে এদের জীবিকানির্বাহ করতে হয়। এদের নিশ্চল অবস্থা এবং গায়ের রঙে বিভ্রান্ত হয়ে পোকা-মাকড় নিঃশঙ্কচিত্তে কাছাকাছি কোথাও উপবেশন করবামাত্রই বহুরূপী চক্ষের-নিমেষে আঠা-কাঠির মত একটা লম্বা জিভ বের করে তার গায়ে ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে মুখের ভিতর টেনে নেয়। বহুরূপী যেমন আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন ক'রে শিকার আয়ত্ত করে, বিভিন্ন জাতের কীট-পতঙ্গকেও সেরূপ লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায়।

গাঁদা, ডালিয়া, সূর্যমুখী প্রভৃতি ফুলের পাপড়ির মধ্যে সাদা, হলুদে বা সবুজাভ একজাতের সুদৃশ্য মাকড়সা দেখা যায়। ফুলের রং অনুযায়ী এদের গায়ের রঙের পার্থক্য হয়ে থাকে। চলবার ধরন ঠিক কাঁকড়ার মত। কাজেই এদের বলে কাঁকড়া-মাকড়সা। ছোট ছোট পাখি ও কুমোরে-পোকারা এদের পরম শত্রু। ফুলের রঙের সঙ্গে দেহের রং মিলিয়ে নিশ্চলভাবে এক জায়গায় বসে থাকে বলে শত্রুরা সহজে এদের খুঁজে বের করতে পারে না। এই লুকোচুরির ব্যাপারটা এমনই নিখুঁত যে, বুঝতে না পেরে পোকা-মাকড়েরা নির্ভাবনায় মধুর লোভে ফুলের উপর উপবেশন করবামাত্রই তাদের খপ্পরে পড়ে প্রাণ হারায়। এদের জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করবার সময় বহুবার দেখেছি—কাঁকড়া-মাকড়সা শিকারের প্রতীক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই স্থানে নিশ্চলভাবে বসে রয়েছে। কোন একটা পোকা ফুলের উপর বসবার উপক্রম করামাত্রই চক্ষের নিমেষে তাকে ধরে ফেলবে। শিকার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হলে ধরা পড়েও সময় সময় উড়ে পালায়। শিকার পালাবার সময় মাকড়সা হয়তো সামনের পা দু'খানা উপরে উঠিয়েছিল—আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক সেভাবেই ঊর্ধ্ব-পদ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে; একটু নড়াচড়া করে পা দুখানা পর্যন্ত যথাস্থানে গুটিয়ে রাখবে না!

খাল-বিল, নানা-ডোবার ধারে ছোট ছোট গাছপালার মধ্যে কাঠির মত এক রকমের মাকড়সা দেখা যায়। শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে শিকারকে ধোকা দেবার জন্যে এরা পা-গুলোকে একত্রিতভাবে উভয়দিকে প্রসারিত করে ঠিক একখণ্ড কাঠির মত সূতার গায়ে লেগে থাকে। জানা না থাকলে সেটা কাঠি, না মাকড়সা—কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই। শিকার জালে পড়বামাত্র হাত-পা ছড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে আক্রমণ করে। শিকার আয়ত্ত করবার পর আবার ঠিক পূর্বের মত কাঠির আকার ধারণ করে' নিশ্চিন্তমনে ধীরে ধীরে তাকে উদরস্থ করতে থাকে।

শ্যাওলা ভর্তি জলাশয়ে হিপোলাইট নামে একজাতের কুচো-চিংড়ি দেখা যায়। চিংড়িগুলো ইঞ্চিখানেকের বেশী বড় হয় না। শরীরের রং বদলে লুকোচুরি করবার ক্ষমতা এদের অদ্ভুত। প্রায়ই এরা জলজ লতাপাতার মধ্যে অবস্থান করে এবং শরীরের রং ঘাস-পাতার রঙের মত বদল করে নেয়। সবুজ ঘাস-পাতার মধ্যে গায়ের রং থাকে সবুজ; কিন্তু বাদামী রঙের ঘাস-পাতার মধ্যে ছেড়ে দিলে সবুজ রং পরিবর্তন করে বাদামী রং ধারণ করে। আরও আশ্চর্যের বিষয়—দিনের বেলায় যে রকমের রং দেখা যায় রাত্রিবেলায় তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে ঈষৎ নীলবর্ণ ধারণ করে। বড় মাছ ও অন্যান্য শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে সহজে শিকার ধরবার জন্যেই এরা এ রকমের লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

আমাদের দেশে গাছপালার মধ্যে বিভিন্ন জাতের কাঠি-পোকার অভাব নেই। এদের শরীরের গঠন এবং গায়ের রং দেখে একখণ্ড শুকনো কাঠি ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। ভয় পেলে উভয়দিকে লম্বালম্বিভাবে হাত-পা প্রসারিত করে এমনভাবে অবস্থান করে যে, ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেও—শুকনো কাঠি, না জীবিত প্রাণী সেটা ঠিক করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এই কাঠি-পোকাদেরই আর এক গোষ্ঠী ক্রম-পরিণতির ফলে গাছের পাতার আকৃতি ধারণ করেছে। পাতার মধ্যে অবস্থান-কালে কিছুতেই এদের খুঁজে বার করা যায় না।

কাঠি পোকার লুকোচুরি—ঠিক যেন শুকনো ডালপালা

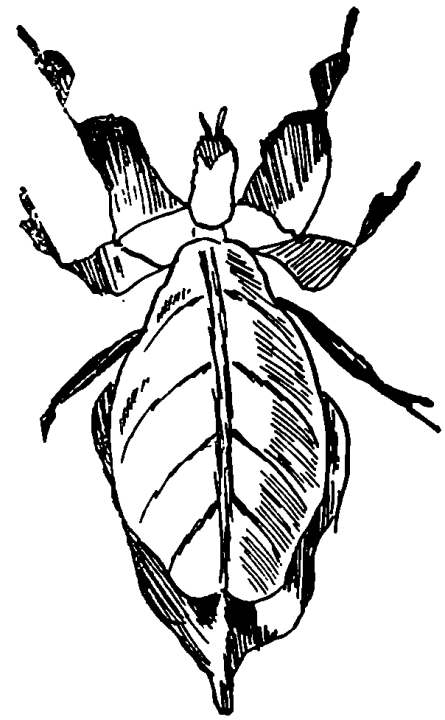

পাতাপোকার লুকোচুরি—পাতাপোকা হুবহু গাছের পাতার মতো দেখতে

অনুকরণে এরূপ অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জনের ফলে দু'দিক দিয়েই এদের সুবিধা হয়েছে। শত্রুরা সহজে এদের খোঁজ পায় না, অথচ আত্মগোপন করে খুব কাছে গিয়ে শিকার ধরতে পারে।

খাল-বিল, নালা-ডোবায় কাঠির মত সরু দু-তিন ইঞ্চি লম্বা একরকমের প্রাণী দেখা যায়। এগুলোকে চল্‌তি কথায় জল-কাঠি বলে। জল-কাঠি উভচর প্রাণী, তবে বেশীরভাগ জলেই কাটায়। শরীরের পশ্চাদ্ভাগে লেজের মত দুটি লম্বা শোঁয়া আছে। শোঁয়া দুটা জলের উপর তুলে দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। ছোট ছোট মাছ ও জলজ পোকা-মাকড় শিকার ক'রে এরা উদরপূরণ করে। শিকার ধরবার আশায় জলজ লতা-পাতার নীচুদিকে মুখ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তখন একটা কাঠি ছাড়া জীবন্ত প্রাণী বলে মোটেই মনে হয় না। ছোট ছোট মাছ কিংবা জলজ পোকা কাছে আসা মাত্রই সাঁড়াশীর মত দাঁড়ার সাহায্যে চেপে ধরে এবং ধীরে ধীরে রস চুষে খায়। জল-কাঠিরা যেখানে থাকে সে-সব জায়গায় জল-বিচ্ছু নামে আর এক জাতের চ্যাপ্টা প্রাণীও দেখতে পাওয়া যায়। এরাও উভচর প্রাণী। জলকাঠি আর জল-বিচ্ছুর পার্থক্য কেবল

শারীরিক গঠনে। অন্যথায় উভয়ের স্বভাব প্রায় একই রকমের। এরাও একটা পচা পাতার মত নিশ্চলভাবে শিকারের অপেক্ষায় বসে থাকে। শিকার কাছে আসলেই সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরে। প্রধানতঃ শিকার ধরার উদ্দেশ্যেই এরা লুকোচুরির আশ্রয় নিয়ে থাকে।

লতাপাতা ঝোপঝাড়ের মধ্যে বিভিন্ন রকমের গঙ্গা-ফড়িং বোধ হয় তোমরা অনেকেই দেখেছ। সব জাতের গঙ্গাফড়িংই কমবেশী লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। অনেকের গায়ের রং সবুজ পাতার মত, আবার কতকগুলোর গায়ের রং শুকনো পাতার মত। কতকগুলো গঙ্গাফড়িংকে অবিকল গাছের পাতা বলেই মনে হয়। গঙ্গাফড়িং পাখিদের উপাদেয় খাদ্য। কাজেই শত্রুর ভয়ে সর্বদা তাদের সন্ত্রস্ত থাকতে হয়, অথচ জীবিকানির্বাহের জন্যে কীট-পতঙ্গ শিকার না করলেও চলে। কিন্তু এমনই নিখুঁত তাদের অনুকরণ শক্তি যে, পাখি তো দূরের কথা, তেমন সন্ধানী চোখও তাদের খুঁজে বের করতে হয়রান হয়ে যায়। দক্ষিণ ভারতে গঞ্জিলাস নামে গঙ্গাফড়িঙের আকৃতি আরও অদ্ভুত। দেখতে ঠিক একটা অর্কিড ফুলের মত। যেমন রং তেমনি গঠন। পাতার গায়ে পিছনের পা আটকে মুখ নীচু করে ঝুলে থাকে। ফুল মনে করে কীট-পতঙ্গেরা কাছে এলেই ধরে উদরস্থ করে। পাখিরাও ফুল মনে করে এদের আক্রমণ করে না।

উঁচু মাচার উপর লতাপাতার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতার প্রান্তভাগে কাঠির মত কি যেন ঝুলছে। এই কাঠির মত পদার্থগুলো একরকম জীবন্ত পোকা, সূতলিপোকা নামে পরিচিত। এগুলো মথ জাতীয় ছোট্ট একরকম প্রজাপতির বাচ্চা। সূতলিপোকার সামনে ও পিছনে কয়েকজোড়া পা আছে। শরীরের মধ্যভাগ সম্পূর্ণ মসৃণ। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে জোঁকের মত হেটে যায়। গাছের সবুজ পাতা এদের খাদ্য। খাদ্য অন্বেষণে দূরে যেতে হলে অথবা কোনক্রমে শত্রুর নজরে পড়ে গেলে এরা মুখ থেকে সূতা ছেড়ে নীচে ঝুলে পড়ে। লুকোচুরিতে এরা খুবই ওস্তাদ। পিছনের পায়ের সাহায্যে গাছের ডাল আঁকড়ে জোঁকের মত মুখ উঁচু করে হয়তো পাতা খাচ্ছে—ওই সময়ে অকস্মাৎ কোন ভয়ের কারণ ঘটলে তৎক্ষণাৎ শরীরটাকে খাড়া রেখেই নিশ্চল হয়ে যায়। দেখে মনে হয় যেন পাতা খসে-পড়া লম্বা একটা ঝোঁটা গাছের গায়ে লেগে রয়েছে। সেটা যে একটা জীবন্ত প্রাণী তা বোঝবার উপায় নেই। ছোট ছোট পাখিরা লতাপাতার মধ্যে সর্বদাই সূতলিপোকার সন্ধান করে বেড়ায়, কিন্তু লুকো-চুরির কৌশলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা প্রতারিত হয়ে থাকে।

শিবপুরের বাগানে একদিন দেখলাম—মাঝারি গোছের একটা গাছের উপরে ছোট ছাট সুদৃশ্য ফুল ফুটে রয়েছে। কয়েকটা ফুল সংগ্রহ করবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু গাছটার গায়ে বড় বড় অসংখ্য কাঁটা। কি করা যায় ভাবছি—হঠাৎ নজরে পড়লো—দু-একটা কাঁটা যেন ঈষৎ নড়ে উঠছে। অনুসন্ধানে বোঝা গেল—যেগুলোকে বিষাক্ত কাঁটা বলে ভেবেছিলাম সেগুলো কাঁটা নয় মোটেই, একজাতের অদ্ভুত পোকা। শত্রুর নজর এড়াবার জন্যে পোকাগুলো ঠিক কাঁটার আকার ধারণ করেছে। এ-ধরনের আরও কত রকমের পোকা যে আমাদের দেশে আছে তার ইয়ত্তা নেই। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেই এরা লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এদের সাধারণ নাম হচ্ছে ঝুড়িপোকা। পূর্বাঞ্চলে বনে-জঙ্গলে চূণের মত সাদা একরকমের ছোট প্রজাপতি দেখা যায়। অধিকাংশ সময়ই এরা ছোট গাছের পাতার উপর ডানা ছড়িয়ে নেপ্টে বসে থাকে। দেখে মনে হয় যেন পাতার উপর চূণের দাগের মত পাখির পরিত্যক্ত মল শুকিয়ে রয়েছে। ফিঙে পাখিরা এদের পরম শত্রু। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়ে যাবার সময়ই এরা পাখিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু পাতার উপরে বসে থাকবার সময় প্রত্যেকেই এগুলোকে পাখির মল বলে ভুল করে।

কলকাতার আশেপাশে বন-জঙ্গলে বাদামী রঙের মাঝারি গোছের কয়েক জাতের প্রজাপতি দেখা যায়। এদের ডানার নীচের দিকের রং শুকনো পাতার মত। শুকনো পাতার মধ্যে ডানা গুটিয়ে বসে থাকলে মোটেই নজরে পড়ে না। এ ছাড়া আরও কয়েক রকমের প্রজাপতি দেখা যায় যারা লুকোচুরিতে খুবই পটু। এদের ডানার নীচের দিকের রং ফিকে বাদামী, তার উপর পাতার শিরা-উপশিরার মত কতকগুলো দাগ কাটা। ডানা গুটিয়ে বসলেই শুকনো পাতা বলে ভুল হবে। পাতা-প্রজাপতির লুকোচুরির কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। একটু অনুসন্ধান করলে আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে এরকমের প্রজাপতির সন্ধান পাবে। দূর থেকে হয়তো তোমার নজরে পড়লো—প্রজাপতিটা উড়ে গিয়ে একটা গাছের উপর বসেছে; কিন্তু কাছে যাও—তার কোন সন্ধানই পাবে না। ডানা গুটিয়ে বসলে ঠিক গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

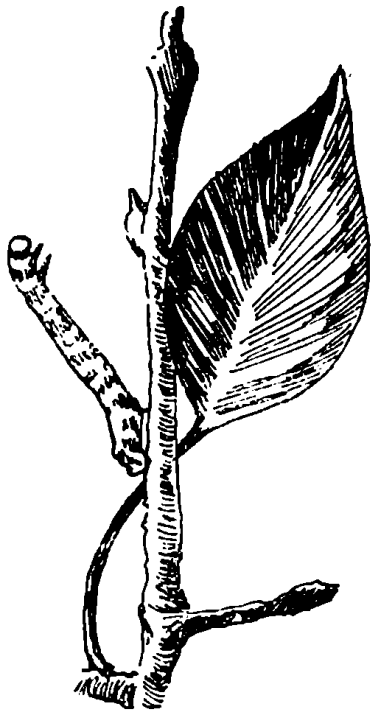

এক জাতের সুতলিপোকার লুকোচুরি—পোকাটাকে সরু ডালপাতার বোটা বলে মনে হয়

শরীরের পশ্চাদ্ভাগে শুঁড়ওয়ালা সবুজ রঙের একজাতীয় প্রজাপতির বাচ্চা পাখিদের উপাদেয় খাদ্য। গাছের পাতা খেয়েই এরা জীবনধারণ করে। দিনের আলো বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এরা খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং পাতাটা যতদূর খাওয়া হয়ে গেছে—সেখানেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে বসে থাকে। দেখে মনে হয় যেন বোঁটার গায়ে এক একটা নতুন কুঁড়ি গজিয়ে উঠেছে। শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার এটাই হলো তাদের ফন্দি।

কীট-পতঙ্গেরা সাধারণতঃ ডিম পেড়েই খালাস : তারা বাচ্চাদের আর কোন খোঁজখবরই লয় না। দুর্বল এবং অসহায় হলেও বাচ্চাগুলো নিজেরাই তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। আত্মরক্ষার জন্যে তারা যে কত রকম লুকোচুরির পরিচয় দিয়ে থাকে তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশের রক্ততিলক প্রজাপতির বাচ্চারা পুত্তলী অবস্থায় নিরাপদে কাটাবার জন্যে এমন অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করে যে, দেখলেই একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগে—কাছে ঘেঁসতেই প্রবৃত্তি হয় না! কাঠপোকারা গাছের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম ফোটবার পর বাচ্চাগুলো গাছের গায়েই অবস্থান করে। গুটি বেঁধে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করবার সময় শত্রুর কবলে পড়বার ভয়ে সেই গাছের ফলের অনুকরণে গুটি তৈরী করে। এদের শত্রু তো দূরের কথা—মানুষেরাও সহজে বুঝতে পারে না যে, সেগুলো গাছের ফল, না পোকার গুটি। ফ্লাটা নামে এক জাতের পতঙ্গের বাচ্চা শত্রুর নজর এড়াবার জন্যে পত্র শূন্য সরু ডালের গায়ে পর পর গুটি তৈরী করে শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে। দেখে ডালের পাতা বা বোঁটায় ঝুলানো ফল বলেই মনে হয়। পাখি এবং কীট-পতঙ্গভোজী প্রাণীরা ভুল করেই এদের স্পর্শ করে না। অথচ একটা গুটি ছিঁড়ে এনে পাখির কাছে ফেলে দাও, তৎক্ষণাৎ উদরস্থ করে ফেলবে। বনে-জঙ্গলে অনুসন্ধান করলে এরকমের শত শত লুকোচুরির কৌশল তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

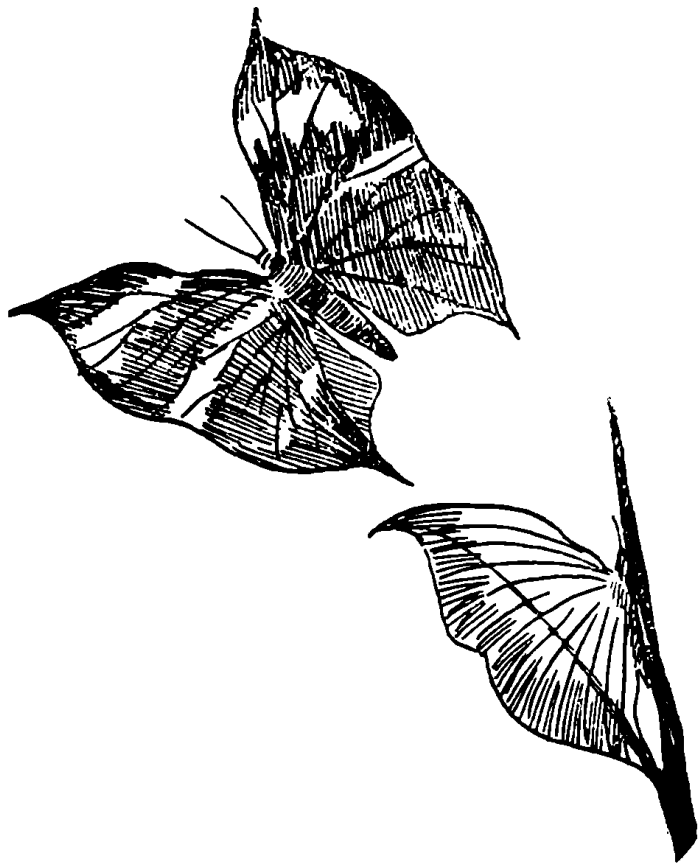

প্রজাপতির লুকোচুরি—প্রজাপতিরা ডানা মুড়ে বসে পাতার আকার ধারণ করে

গোপালচন্দ্রের হস্তলিপি

১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে 'বিজ্ঞানের বিস্ময়—ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ' রচনার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি

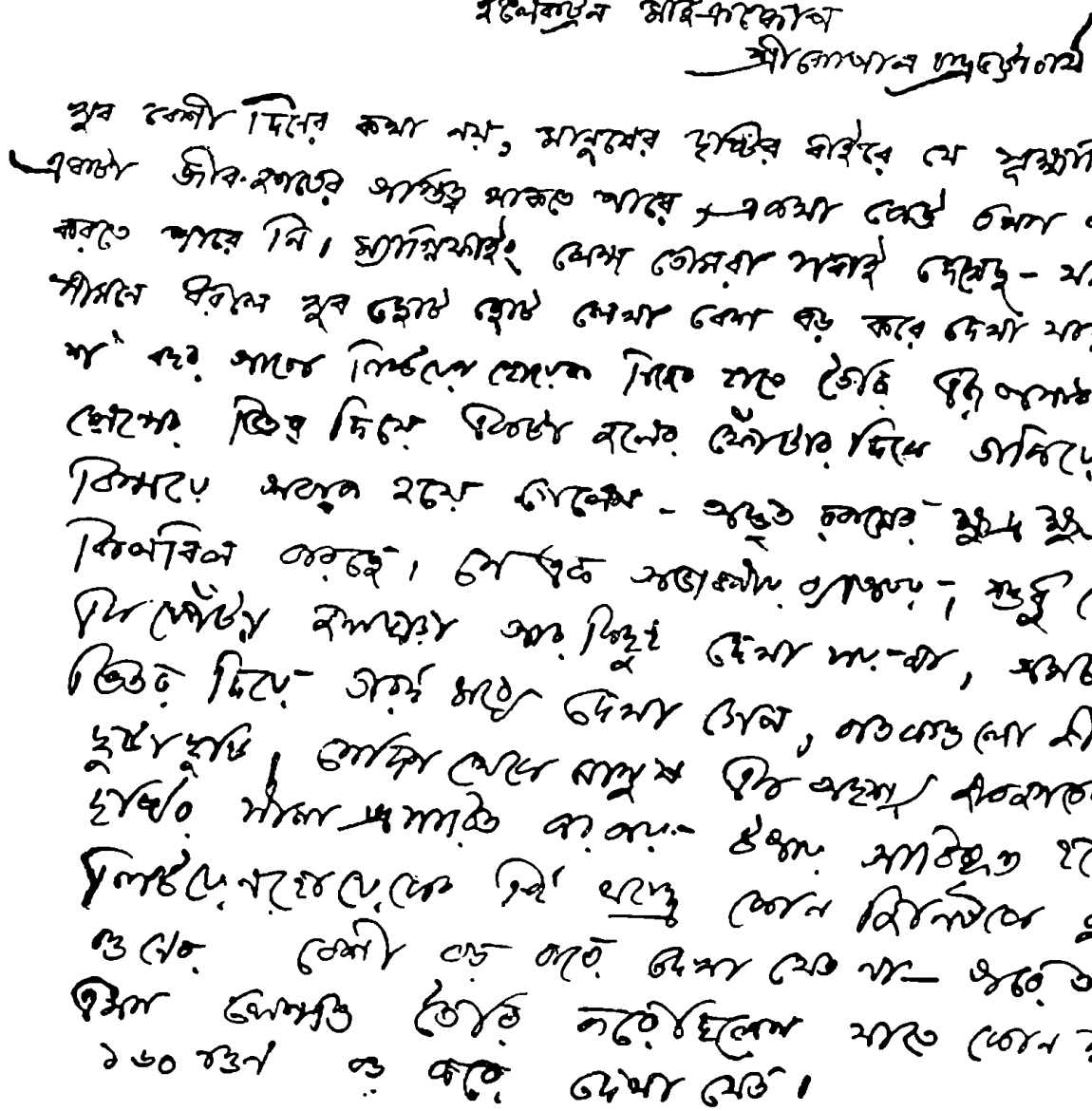

সাপ ও বেজীর লড়াই

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

অনেক দিন আগের কথা। ঘটনাক্রমে সাপের বিষ নিয়ে পরীক্ষা করতে হয়েছিল। তখন একটা বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলছিল—তথাকথিত বিষঘ্ন উদ্ভিজ্জ রস খাইয়ে সর্পদষ্ট প্রাণীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব কিনা? কেউ কেউ বলেছেন—বিষঘ্ন কোন উদ্ভিদের রস খাইয়ে সর্প বিষের প্রতিকার করা সম্ভব। শোনা যায়, বেজী এরূপ অব্যর্থ বিষঘ্ন উদ্ভিদের সন্ধান জানে। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত কথাই বলেছেন।

আমাদের দেশে যে সব সর্পবিষঘ্ন উদ্ভিদের কথা প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত তার মধ্যে বিশল্যকরণী (আয়াপান?) ও ইশার মূল নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে প্রকৃত রহস্য নির্ণয়ের উদ্যোগী হয়েছিলাম। যে সকল বিষধর সাপের দংশনে প্রাণীদের মৃত্যু অবধারিত. সে সব বিষ খাইয়ে দিলে প্রাণীদের মৃত্যু ঘটে কিনা, দেখবার জন্যে পরীক্ষাধীন সাদা ইঁদুরকে গোখরা সাপের বিষ (ঈষৎ হল্‌দে রঙের ছোট ছোট চৌকা দানার মত কোব্রা ভেনম) ছোট ছোট ময়দার ডেলায় পুরে খাইয়ে দেবার ফলে মৃত্যুর লক্ষণ তো দূরের কথা, তাদের মধ্যে কোন দৌর্বল্যের লক্ষণও দেখা গেল না। কিন্তু সামান্য পরিমাণে কোব্রা ভেনম ইনজেকশন দেবার পর শুষ্ক ইশার মূলের নির্যাস ও বিশল্যকরণীর রস পিপেটে করে খাইয়ে দিয়ে তিনটি ইঁদুরের একটিকেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি।

এসব বিবরণ প্রকাশিত হবার পর নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম. মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, দিনাজপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে ডাকযোগে কেউ কেউ আমাকে বিভিন্ন জাতীয় সর্পবিষনাশক ছোট ছোট ডালপালা ও লতাপাতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অধিকাংশ প্যাকেটের লতাপাতাই পচে বা শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেউ উদ্ভিদের নাম বা অন্য কোন পরিচিতিও দেন নি। সাপের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় বেজী মাঝে মাঝে ছুটে গিয়ে যে উদ্ভিদটির ডাঁটা চিবিয়ে অবসাদ দূর করছিল. সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে পরিচয় দিয়ে ত্রিপুরা থেকে একজন ওই জাতীয় গাছের ছোট্ট একটি ডাল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দু-একটা বিকৃত পাতা ছাড়া ডালটার বাকি পাতাগুলি চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করে বোটানিক্যাল গার্ডেন্সের তদানীন্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সহায়তায় উদ্ভিদটার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া সম্ভব হলো—গাছটার নাম Aristoloctia Indica, বাংলায় যাকে বলা হয়—ইশার মূল। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীতেও ইশার মূলের সর্পবিষঘ্ন ক্ষমতার কথা বর্ণিত আছে। সর্পবিষের প্রতিষেধক হিসাবে ইশার মূলের ব্যর্থতার কথা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি, যদিও সংগৃহীত জিনিসটার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম না। এবারে পাওয়া ইশার মূল সম্বন্ধে সেরূপ কোন সন্দেহের কারণ না থাকলেও কোন কোন বিষয়ে সংশয়মুক্ত হতে পারি নি।

যা হোক, যাবতীয় সন্দেহ নিরসনের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ আবদ্ধ স্থানে সাপের সঙ্গে বেজীর লড়াই বাধিয়ে সরেজমিনে পরীক্ষা চালাতেই উদ্যোগী হলাম। গবেষণাগারের পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রকাণ্ড একটা গাছঘর Green House ছিল। গাছঘরটা বিভিন্ন দেশের দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ ও লতা-গুল্মের সমাবেশে শান্ত সবুজ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ঘরটার প্রবেশ-পথের দুই দিকে তারের জালে ঘেরা ১৮'।২৫' মাপের দুটি বেশ বড় ঘর ছিল। পরীক্ষার কাজে ব্যবহারের জন্যে এর একটাতে খরগোস, গিনিপিগ, সাদা ইঁদুর প্রভৃতি রাখা হতো। অপর ঘরটায় থাকতো দেশী-বিদেশী নানা জাতের ছোট ছোট পাখি। যখনকার কথা বলছি, এই ঘরটায় তখন কোন পাখি ছিল না। এই ঘরটাই সাপের সঙ্গে বেজীর লড়াই বাধাবার উপযুক্ত স্থান বলে মনে হলো। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে অনেক কিছু করবার দরকার এবং সেটা যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষও বটে। অনেক অনুসন্ধানের ফলে দুই রকম ইশার মূলের সন্ধান পাওয়া গেল। উভয়েই লতাজাতীয় উদ্ভিদ। একটার পাতা ও ফুল বড়, অপরটার ফুল ও পাতা ছোট। বড় ইশার মূলের ফুল নীল রঙের পানের মত, নীচের দিকে এক পাশে ঘটের মত একটা পাত্র থেকে ধনেশ পাখির ঠোঁটের মত একটা লম্বা ঠোঁট বেরিয়ে থাকে। কাজেই দূর থেকে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছোট ইশার মূলের পাতাগুলি খুব ছোট আকারের। দুটা টবের মধ্যে দু-রকমের ইশার মূলের গাছ লাগিয়ে জালের ঘরে রেখে দেওয়া হলো। ঘরটার মাঝখানে

একটা পৈঠার মধ্যে নীল কল্‌সী ও পর্তুলেকা জাতীয় লতানে গাছ লাগিয়ে দিলাম, যাতে সারা মেঝেটায় ঘাস-পাতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মেঝে থেকে প্রায় হাত-খানেক উঁচুতে তারের জালটার গায়ে একটা ট্র্যাপ ডোরের ব্যবস্থা করা হলো। কয়েক মাসের মধ্যেই ইশার মূলের গাছ দুটি বেশ বড় হয়ে উঠলো এবং লতাপাতাগুলিও মেঝেতে অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। বেদেদের কাছ থেকে একটা পূর্ণবয়স্ক বেজী সংগ্রহ করে বড় একটা খাঁচার মধ্যে সেটাকে জালের ঘরের একপাশে রেখে পোষ-বার ব্যবস্থা করা হলো। বাইরে থেকে দড়ির সাহায্যে খাঁচার দরজা খোলা ও বন্ধ করবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বিষধর বুনো সাপ সংগ্রহ করাই হলো মুস্কিল। পরীক্ষার কাজের জন্যে যারা লেবোরেটরীতে ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোস, ব্যাং প্রভৃতি সরবরাহ করতো, তাদের শরণাপন্ন হলাম। তারা বিষদাঁত ভাঙ্গা সাপের যোগান দেবার কথা জানালো। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষার আয়োজন করেছিলাম, তার জন্যে প্রয়োজন ছিল বুনো বিষধরের। ওদের সহায়তায় একজন সাপুড়িয়াকে বুনো গোখরো সাপ সরবরাহে রাজী করানো হলো। কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা করতে হলো বেশ কিছুদিন। অবশেষে বুনো একটা কেউটে ধরা পড়লো। নির্দিষ্ট দিনে হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়ে সাপটাকে লেবোরেটরীর জালের ঘরটার কাছে নিয়ে এসে ট্র্যাপ ডোরের মধ্য দিয়ে জালের ঘেরার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার পর সাপুড়ে অতি সন্তর্পণে হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলে দিল। ঢাকনা খুলতেই সাপটা হাঁড়ির মধ্যেই স্প্রিংয়ের মত খাড়া হয়ে উঠলো এবং ফণা বিস্তার করে ঈষৎ দোল খেতে খেতে হিস্ হিস্ শব্দ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই ফণা গুটিয়ে কিলবিল করতে করতে ইশার মূলের টব দুটার আড়ালে চলে গেল। বেজীটা এতক্ষণ খাঁচার মধ্যেই বন্ধ ছিল এবং খাঁচাটা ছিল সাপের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কাজেই প্রথমেই সে সাপটাকে দেখতে পেয়েছিল কিনা বুঝা গেল না। খাঁচার দরজা খুলে দিতেই টবের আড়ালে সাপটাকে দেখেই প্রবল উত্তেজনায় বেজীর লেজ ও ঘাড়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠলো। পরক্ষণেই ছুটে গেল আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে সাপটার দিকে। বেজীটাকে দেখে সাপটা টবের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই ফণা বিস্তার করে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ করতে লাগলো। বেজীটা তৎক্ষণাৎ ঘুরে গিয়ে অপর দিক থেকে আক্রমণের উদ্যোগ করতেই সাপটা তাকে লক্ষ্য করে হাতুড়ির আঘাতের মত প্রচণ্ড একটা ছোবল মারলো। বেজীটা কিন্তু ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ-গতিতে তফাতে সরে গেছে। কাজেই ছোবলটা গিয়ে পড়লো মেঝের উপর। পরক্ষণেই আবার ফণা বিস্তার করে মুখ ঘুরিয়ে বেজীর গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো। বেজীটার চাঞ্চল্য ক্রমশঃই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখেই সে সাপটার চতুর্দিকে একবার এদিক আবার ওদিক কেবলই ছুটাছুটি করতে লাগলো। উদ্যত ফণা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে সাপটা বেজীর গতিবিধির উপর নজর রাখবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মনে হলো, অতি ক্ষিপ্রগতির জন্যে সে বেজীর উপর ঠিকমত নজর রাখতে পারছে না। প্রায় মিনিট দুয়েক এভাবে কাটবার পর বেজীটা সাপের লেজের দিকে আক্রমণের চেষ্টা করতেই ফণা ঘুরিয়ে প্রচণ্ড বেগে সাপটা আবার ছোবল মারলো। বেজীটাও যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। চোখের নিমেষে সরে যেতেই আঘাতটা এবারও গিয়ে পড়লো মেঝের উপর। আরও কিছুক্ষণ এভাবে পাঁয়তারা কষবার সময় সাপটা বার-তিনেক ছোবল মারবার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে একটা ছোবল বেশ জোরেই বেজীটার পিছনের দিকটায় পড়লো। সে ছুটে গিয়ে জলের পৈঠার ধারে লতা-পাতার উপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। ইশার মূল বা অন্য কোন লতা পাতাই বেজীটাকে চিবুতে দেখা যায় নি। বেজীটা সরে যাবার পরেও সাপটা ফণা বিস্তার করেই দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে ফণা গুটিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু জালের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কোন উপায়ই ছিল না। সাপটাকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে দেখেই পৈঠার পাশ থেকে ছুটে এসে বেজীটা প্রচণ্ড বেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলার পিছন দিকটায় কামড়ে ধরলো। অনেক ছুটাছুটি এবং অনেকবার বিষ ঢেলে সাপটা বেশ নিস্তেজ হয়েই পড়েছিল, কাজেই নানা-ভাবে লেজের মোচড় দিয়ে বেজীটাকে জড়িয়ে ফেলাও তার পক্ষে সম্ভব হলো না। দেখতে দেখতে বেজী সাপটাকে দু-টুকরা করে কেটে ফেললো। এই ঘটনার পরে বেজীটা বেশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই ছিল, চাঞ্চল্যও কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি।

যা হোক, যে উদ্দেশ্যে এত উদ্যোগ-আয়োজন করে পরীক্ষাটা করা হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হলো না, সাপটার প্রবল দংশনের পরেও বেজীটাকে কোন লতা-পাতা চিবুতে দেখা গেল না। তবে কি বেজীর সর্পবিষঘ্ন ওষুধ জানবার প্রবাদের মধ্যে মূলতঃ কোন সত্য নেই, মোটের উপর সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে মনে হয়েছিল—সাপের সঙ্গে বেজীর খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ

সাপ দেখলে বেজী তাকে আক্রমণ করবেই। বিষধর বুনো সাপকে নিস্তেজ করে ফেলবার জন্যে আক্রমণের ভয় দেখিয়ে উত্তেজিত করে তাকে বিষমোক্ষণে প্ররোচিত করে। প্রথম দুই-একবার ছোবল মারবার ফলেই বোধহয় বিষের থলি নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড আঘাতে বিষদাঁতও ভেঙ্গে যায়। বার বার এরূপ ছোবল মেরে ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে বেজী তাকে আক্রমণ করে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। কিন্তু এক্ষেত্রে মৃত সাপটার বিষের থলিতে বিষ ছিল কিনা অথবা বিষদাঁত অটুট ছিল কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া কারুর রক্তের সঙ্গে বিষ মিশে গেলে কোন বিষঘ্ন ভেষজের রস গলাধঃকরণ করলেই যে জীবন রক্ষা পাবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। পূর্বোক্ত পরীক্ষার ফলে একথাই মনে হয়েছে। তথাকথিত সর্পবিষঘ্ন ভেষজ থেকে কোন বিষঘ্ন Active principle বা উপক্ষার (Alkaloid) পাওয়া গেছে কিনা, জানা নেই। যথা-সম্ভব এসব সন্দেহ নিরসনের জন্যেই পুনরায় বিস্তৃত ভাবে পরীক্ষা চালাবার কথা চিন্তা করছিলাম। নানা কারণে এতদিন তা হয়ে ওঠে নি। তবে ভবিষ্যৎ কর্মীদের পক্ষে কিছু সহায়ক হতে পারে ভেবে এই মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হলো।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৭৯

জীবন চরিত

আমার বড়দা

শ্রীপঙ্কজবিহারী ভট্টাচার্য

আমার বড়দা গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য গত ৮ই এপ্রিল (১৯৮১) পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশের বিচিত্র কাহিনী অনেকেই হয়তো জানে। আমি তাঁর শৈশবের কাহিনী এখানে বলছি। এই কাহিনী অজ্ঞাত বলা চলে।

পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) ফরিদপুর জিলার লোনসিং গ্রামে ১৮৯৫ সালের ১লা আগস্ট বড়দার জন্ম হয়। আমরা চার ভাই। এদের মধ্যে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। শৈশবে পিতৃহারা হয়ে বহু দুঃখকষ্টের মধ্যে আমাদের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। বাবার মৃত্যুর সময় বড়দার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। সংসারে উপার্জনকারী কেউ না থাকায় আমরা দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছিলাম।

লোনসিংয়ের জমিদার গৌরচন্দ্র দাস (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) আমার বাবাকে—অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য (বাবা ছিলেন তাঁদের কুলপুরোহিত।) বুয়াগ্রাম থেকে এনে কিছু নিষ্কর (ব্রহ্মোত্তর) বাস্তুজমি দিয়ে দীঘির পূর্ব পাড়ে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। এ ছাড়া জমিদারী এস্টেটে বাবা চাকুরীও করতেন। বাবার মৃত্যুর পর অবস্থাপন্ন যজমান শিষ্যরা কিছু কিছু সাহায্য করতেন। মামা কামিনী কুশারী মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর এস্টেটে দেবালয়ের ম্যানেজার ছিলেন। তিনিও আমাদের মাসে মাসে কিছু সাহায্য করতেন।

পাঠশালার পড়া শেষ করে বড়দা লোনসিং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। প্রতি বছর ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করায় স্কুল কমিটি ওঁকে বিনা-বেতনে পড়বার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অধিকন্তু পুরস্কার হিসাবে মূল্যবান পাঠ্যপুস্তক, অভিধান, গ্লোব, মানচিত্র, ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্স প্রভৃতি উপহার দেন। ঐ সবের সাহায্যে তাঁর শিক্ষার পথ অনেকটা সুগম হয়েছিল।

এগারো বছর বয়সে বড়দার উপনয়ন হয়, শিষ্য-যজমান রক্ষার্থে সেই বছরেই তাঁকে দীক্ষা নিতে হয়। পূর্ববঙ্গে বর্ষাকালে প্রতি গ্রামই অল্পাধিক জলমগ্ন থাকে। গামছা পরে খাল, বিল, খানা ডোবা পার হয়ে বড়দা যজমানের কাজ করে আসতেন। কোন কোন দিন স্কুলের বেলা হয়ে গেলে মা বই, খাতা, পেন্সিল নিয়ে আমতলা বা তালতলায় দাঁড়িয়ে থাকতো। মায়ের কাছ থেকে জামাটি নিয়ে গায়ে দিয়ে দাদা বই, খাতা ইত্যাদি নিয়ে স্কুলে ছুটতো। বেলা ১টায় আধঘণ্টা টিফিনের ছুটিতে ভাত খেয়ে ক্লাশে যেত। এত কষ্ট করে ১৯১৩ সালে বড়দা কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লোনসিং স্কুলের প্রথম বারের প্রেরিত ছাত্রের এই গৌরবময় কৃতিত্ব উক্ত স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীর যেমন গর্বের বিষয়—তেমনি লোনসিং গ্রামবাসীর পক্ষেও গর্বের। স্কুল ও গ্রামবাসীদের সম্মিলিত সংবর্ধনা হলো। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বড়দাকে টাকা, মেডেল ও বিবিধ

মূল্যবান পুস্তকাদি উপহার দিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে বড়দা ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। ঐ সময় (১৯১৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে। ১৯১৫ সালে বড়দা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-হোস্টেলে থাকে। হোস্টেলের খরচ বাড়ে, অপরের সাহায্যে বড়দার পড়ার খরচ চলছিল, যাঁরা সাহায্য করতেন—তাঁরাও সাহায্য বন্ধ করলেন অথচ খরচও অনেক বেড়ে গেল। সুতরাং বড়দার পড়া ওখানেই শেষ। তিনি স্বগ্রামে চলে আসেন এবং গ্রাম থেকে চার মাইল দূরবর্তী পণ্ডিতসার হাইস্কুলে ১৬ টাকা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। জেলা বোর্ডের রাস্তার চার মাইলের ভিতর ১৭ জায়গা ভেঙ্গে দারুণ স্রোত বইত। তিনি অতিকষ্টে সেইসব জায়গা পার হতেন। স্কুল থেকে ১০ মিনিটের পথ মামাবাড়ী—দক্ষিণপাড়া, কিন্তু সেখানে থাকতেন না কারো কারো বিরাগভাজন ও তাঁদের ভিতর অশান্তি হবার ভয়ে। স্কুলে প্রায়ই দেরীতে পৌঁছানোর দরুন প্রধান শিক্ষক বরদাবাবু একদিন ডেকে বড়দার সব কথা শুনলেন এবং স্কুল রুটিন থেকে প্রথম পিরিয়ড অব্যাহতি দিলেন। কিছুদিন বাদে বড়দা লোনসিং হাইস্কুলে ২০ টাকা বেতনে ভূগোল শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হলেন।

-বড়দার বয়স আমার থেকে চার বছর বেশী। এতকাল বড়দার প্রসঙ্গে যা কিছু দেখেছি তা বলতে গেলে বিরাট হয়ে যাবে, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি দিক নিয়ে বলছি। বড়দাই আমাদের সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। কর্তব্য সম্পাদনে স্থানান্তরে যাবার জন্য প্রয়োজনে গামছা পরে নিতেন। এই কথায় কেউ কেউ হয়তো মর্যাদা-হানির কথা ভাবতে পারেন—কিন্তু সত্য গোপন করলে ইতিহাস হয় না। ছোট থেকেই মানুষ বড় হয় নীচু থেকেই মানুষ উপরে ওঠে।

আমার মার ছিল ভীষণ বই পড়ার বাতিক। আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে অনেক রাত পর্যন্ত নানা গল্পের বই, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পড়তেন। বড়দাও সেইসব বই অনেক সময়ে গোপনে পড়তেন, ফলে বড়দার বই পড়ার ঝোঁকও বেড়ে যায়।

যদিও বড়দা স্নাতক নন কিন্তু ভূগোল শিক্ষক হিসাবে দশমশ্রেণীতেও পড়াতেন। ছাত্রেরা সবাই তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন, স্কুলের বন্ধের সময় বড়দা বাড়ী থাকতেন না। বনে-জঙ্গলে, খাল-বিল, পুকুর প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াতেন প্রাকৃতিক রহস্য, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা ইত্যাদি বিচিত্র তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য। এই সব পর্যবেক্ষণের ফল তিনি খাতায় লিখে রাখতেন এবং সুযোগমত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাঠাতেন।

লোনসিং গ্রাম থেকে দেড় মাইল দূরে কলুকাঠি গ্রামে বহুকালের একটি অশ্বত্থ গাছ। কিছু উঁচু থেকে মোটা তিনটি ডাল তিন দিকে বেরিয়ে গেছে—মাঝখানটায় বিরাট গহ্বর। অনেক দিন ধরে ঝরাপাতা ও বৃষ্টির জল জমে সাংঘাতিক গ্যাস দিনে রোদের তাপে ধূঁয়ার মত উঠতে থাকে। তাই দেখে অনেক স্ত্রীলোক মায়ের উদয় হয়েছে বলে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, গাছের গায়ে তেল সিঁদুর, মণ্ডা, বাতাসা, দিয়ে পূজা দিতেন, ঢাক-ঢোলের বাজনা, মাটিতে গড়াগড়ি, মানত ইত্যাদি করতেন। শনি ও মঙ্গলবারই বেশী লোক সমাগম হয় এবং রাত্রে কেউ থায় না।

পাড়ার শ্যামাচরণ শীল বয়সে বড় তাই শ্যামা কাকা—সর্বদাই হাজির ও আজ্ঞাবহ, বিশেষ করে আমরা তাদের কুলপুরোহিত। বড়দার নির্দেশ হলো রাত ১২টায় একটা মই, হ্যারিকেন ও একটা গামলা নিয়ে আমাদের যেতে হবে কলুকাঠি গ্রামে যেখানে দেবীর উদয় হয়েছে।

সাথী তিনজন। হাতে হ্যারিকেন, লাঠি, মই ও একটা কাঠের গামলা। মই বেয়ে বড়দা নিজে উঠে গিয়ে সেই পচা রাবিশগুলি গামলা ভর্তি করে মইয়ের উপর দাঁড়ানো শ্যামাকাকার হাতে দিলেন। গাছ থেকে নেমে সবাই বাড়ি ফিরে আসলাম। পরদিন দুপুর বেলা সেই পচা রাবিশগুলি রোদে ফেলে রাখতেই গ্যাস (ধোঁয়া) উঠতে থাকে - সবাই বুঝতে লাগলো রহস্য কি?

লোনসিং মিয়া বাড়ির আমগাছের উপর রাত ১০টায় চাঁদের আলোয় একখানা পাতলা সাদা শাড়ির আচল হাওয়ায় উড়ছে দেখে ভূত ভূত বলে চীৎকার। চীৎকার শুনে শ্যামাকাকা সহ বড়দা ঘটনাস্থলে হাজির; মই বেয়ে দুজনায় গাছে উঠে দেখে বিরাট এক ফানুস। সেটাকে নামিয়ে আনা হয়, সবাই অবাক। সাদা কাগজটি পাতলা হওয়ায় শাড়ির আচলের মত উড়ছিল।

অমাবস্যার গভীর রাতে যোগপাট্টা বিলের ধার দিয়ে একটা আগুনে-সাইকেল চলছে। একজন পায়খানায় বসেছিল—আগুনের চাকা ঘুরতে দেখে ভীষণ চীৎকার করতে থাকে। গ্রামের লোকজন জড়ো হয়—সবাই বলাবলি করতে থাকে অন্ধকার পক্ষেই ভূতেরা আগুনের সাইকেল চেপে পরগনা টহল দিয়ে বেড়ায়। তখন শ্যামাকাকা ও বড়দা গিয়ে বললেন—সবাই চুপ করে দাঁড়ান। আগুনের চাকা এদিকে আসছে—দেখা

যাক না। খানিক পরেই চাকা এসে থামলো। উলঙ্গ চালক বলে উঠলো—দে একটা বিড়ি দে, বিড়ি ধরাবার জন্যই তো শ্মশান থেকে পোড়া কাঠ নিয়ে চলেছি। সবাই চিনতে পারলো সে পাগলা অতুল।

গ্রামে পাঁচীর মার ভিটাতে আগুন জ্বলতে অনেকে দেখেছে। কৌতূহলী বড়দা দুজন সঙ্গী নিয়ে অন্ধকার রাতে পাঁচীর মার ভিটার দিকে রওনা হলেন। তখন বর্ষাকাল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সঙ্গে আছে ছাতা, লণ্ঠন, দেশলাই। অন্ধকারের মধ্যে ঝোপের আড়ালে একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা দেখে বড়দা এগিয়ে গেলেন। এবার স্পষ্ট আলো কোন পরিবর্তন নেই। আরও অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা ভাবতে ভাবতে আলোটা যেন হঠাৎ নিভে গেল। পর মুহূর্তেই আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। আরও কয়েক হাত এগিয়ে দেখা গেল বেশ বড় একটা অগ্নি-কুণ্ড। আগুনের শিখা নেই, আলোর তীব্রতা নেই স্নিগ্ধ নীলাভ আলো। দেখা গেল—কাঁতত একটা বড় গাছের গুঁড়ি থেকে আলো নির্গত হচ্ছে। গুঁড়িটার অনেকটাই পচে গেছে। গুঁড়িটার পাশেই বড় একটা কচু গাছ, তার একটা পাতা হেলে পড়েছিল। একটু বাতাসেই উঠা-নামা করে আন্দোলিত হতো। দূরে থেকে আলোটাকে একবার জ্বলতে আবার নিভতে দেখার কারণ ঐ আন্দোলিত কচুপাতার উঠা-নামা। গ্রামের লোকেরা বলতো আলোর দানোরা হা করলেই আগুন জ্বলে ওঠে। গুঁড়িটার গা থেকে আলো বিকিরণকারী কতকগুলি কাঠের কুচি সংগ্রহ করে বড়দা নিয়ে এল। দিন দুই পরে ঐ আলো দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণ কাঠের টুকরা কেন আলোক বিকিরণ করে বুঝতে পারে নি। এই সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতার কাহিনী ১৩২৬ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। গ্রামে অস্পৃশ্যদের মধ্যে বিনাপয়সায় লেখাপড়া প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি 'কমলকুটীর' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। সেখানে ঝিনুক ইত্যাদি দিয়ে নানা কারুকার্যময় শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুতে শিক্ষা দেওয়া হতো—বহুবিধ শিল্প-কর্ম শিক্ষা করে গরীবেরা বেশকিছু উপার্জন করতেন।

গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজের অত্যাচার-অবিচার বড়দার উপরেও আরোপিত হয়েছিল। ১৯১৭ সালে তিনি 'শতদল' নামক হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা বের করেন তিনিই সম্পাদক—তিনিই শিল্পী। চিত্রাঙ্কনে বড়দা পারদর্শী ছিলেন। সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতেন শতদলে।

জারিগান, কবিগান রচনা করে সুর, তাল ইত্যাদি সংযোজন করে তিনি শিক্ষা দিতেন। পূর্ববাংলার (বাংলা-দেশ) জারী গায়কদের মধ্যে আজও গুরু বন্দনায় গোপাল ভট্ট-র নাম উচ্চারিত হয়।

বোস ইন্সটিটিউটে গবেষণারত তরুণ বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
ফোটো : পরিমল গোস্বামী

১৯১৯ সালে এক বিবাহোপলক্ষে তিনি কলকাতায় আসেন। তখন তাঁর বয়স ২৪। কাশীপুরে র‍্যালী ব্রাদার্সের টেলিফোন অপারেটরের কাজ নেন। ইতিমধ্যে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত "পচা গাছপালার আলোবিকিরণ ক্ষমতা" প্রবন্ধটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নজরে পড়ে। তিনি বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের (পুলিনবিহারী দাসের বাড়ি ছিল লোনসিং গ্রামে) মাধ্যমে বড়দার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বড়দাকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বিজ্ঞান গবেষণায় যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। ১৯২১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বড়দা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন। এর পরের কাহিনী অনেকেরই জানা। সেজন্য বড়দার কথা এখানেই শেষ করলাম।

শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্মরণ-সভা

বিশিষ্ট প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পুরোধা ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রয়াণে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য স্মরণ-সভার আয়োজন করা হয়। এখানে কয়েকটি বিশিষ্ট সভার প্রতিবেদন দেওয়া হলো। প্রতিবেদক : শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মরণ-সভায় ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।
ফোটো : সত্যেন্দ্রনাথ শেঠ

কিশোর কল্যাণ পরিষদ

গত ১৬ই মে উত্তর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে কিশোর কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বিশিষ্ট প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও পরিষদের শুভানুধ্যায়ী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মরণে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রারম্ভে পরিষদের পক্ষ থেকে গোপালচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সম্পাদিকা রমা মহিন্তা। প্রকৃতি-বিজ্ঞানে ও বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে গোপালচন্দ্রের বিশিষ্ট অবদানের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন পরিষদ-সভাপতি ডঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ জয়ন্ত বসু, ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, স্কুলের শিক্ষক তরুণ দত্ত এবং ছাত্র মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। সভাপতি ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন : গোপালচন্দ্র নাম-যশের দিকে দৃষ্টিপাত না করে যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে বিজ্ঞান-চর্চা করে গেছেন তা শুধু তরুণদের নয়, বিজ্ঞানীদেরও অনুকরণযোগ্য।

পশ্চিম বাংলার বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের উদ্যোগে গোপাল-চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য যথোচিত কর্মসূচী গ্রহণ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গোপালচন্দ্রের রচনা সংকলন প্রকাশের দুটি প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করে তা গৃহীত হয়। সভায় সময়োচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীলেখা ভট্টাচার্য, সুতপা চক্রবর্তী ও শুক্লা গঙ্গোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

১৬ই এপ্রিল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্র ভবনে' আয়োজিত স্মরণ-সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি ডঃ বলাইচাঁদ কুণ্ডু। প্রারম্ভে গোপালচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সভাপতি ডঃ কুণ্ডু।

বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে গোপালচন্দ্রের নিবিড় সম্পর্ক ও সুদীর্ঘকাল পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনার কথা উল্লেখ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ জয়ন্ত বসু, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডঃ সুখময় ভট্টাচার্য, ডঃ শ্যামসুন্দর দে, ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগলকান্তি রায় প্রমুখ।

গোপালচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্যে সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গোপালচন্দ্রের স্মরণে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তাব করেন কয়েকজন বক্তা।

সারা বাংলা বিজ্ঞান ক্লাব প্রস্তুতি কমিটি

২রা মে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সারা বাংলা বিজ্ঞান ক্লাব প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে একটি স্মরণ-সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডঃ শশাঙ্কচন্দ্র ভট্টাচার্য।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানে এবং বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় গোপালচন্দ্রের বিশিষ্ট অবদানের কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডঃ জয়ন্ত বসু, ডঃ জগবন্ধু হালদার, ডঃ সুখময় ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা কমলা কাঞ্জিলাল, কবীর বসু চৌধুরী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

গোপালচন্দ্রের স্মৃতিতে বিজ্ঞান ক্লাব-সমূহের পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব সভায় উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। এছাড়া আর একটি প্রস্তাবে গোপালচন্দ্রের জীবনী ও রচনা-সমূহের একটি সংকলন প্রকাশের জন্যে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়।

উল্টাডাঙা নাগরিক সমিতি

২৭শে এপ্রিল উল্টাডাঙা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে আরিফ রোডে একটি স্মরণ-সভা আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ডঃ শশাঙ্কচন্দ্র ভট্টাচার্য। গোপালচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তৃতা করেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডঃ অজিতকুমার মেদ্দা, ডঃ কান্তিলাল চৌধুরী, সুবীর ভট্টাচার্য, সুবীর সেন প্রমুখ।

সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে গোপালচন্দ্রের নামে উল্টাডাঙার আরিফ রোডের নামকরণের দাবি জানানো হয় এবং কলিকাতা পুরসভাকে এবিষয়ে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি

২৩শে মে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে পরিষদ-ভবনে একটি স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য। সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক রতনলাল ব্রহ্মচারী, ডঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ বলাই চাঁদ কুণ্ডু, অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস, ডঃ রতনমোহন খাঁ, যুগলকান্তি রায় প্রমুখ। সভায় কয়েকটি সময়োচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। গোপালচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট কাল নীরবতা পালন করা হয় এবং স্মৃতি রক্ষার জন্যে কয়েকটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি আয়োজিত স্মরণ-সভায় যে শ্রদ্ধাঞ্জলি পঠিত হয় তন্মধ্যে কয়েকটি আমরা এখানে প্রকাশ করলাম—সম্পাদক]

20/5/81

ডক্টর গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ডি. এস-সি. মহাশয়ের প্রয়াণে আমি বেদনা বোধ করছি। ওই উপাধি তিনি বড়ো বিলম্বে পেলেন। দু'দিন ভোগ করতে পারলেন না। তবু ভালো যে যাবার আগে তিনি তাঁর বহুদিনের প্রচণ্ড সম্মান দেখে যেতে পারলেন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সবাইকে আমার সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর আত্মার শান্তি হোক। শোকসভায় উপস্থিত হতে অক্ষম বলে আমি দুঃখিত।

অন্নদাশংকর রায়

শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্মরণ-সভায় আমি নিমন্ত্রিত হওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। বিজ্ঞান সাধনায় গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের অবদান অপরিসীম। তিনি বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃত ছিলেন।

আমি ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ইন্দ্রশেখর রায়

২২/৫/৮১

আপনার ২০।৫।৮১ তারিখের আমন্ত্রণ পত্র গত সন্ধ্যায় পাইয়াছি। আপনাদের সভায় যোগদান করিবার আমার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি যাইতে পারিতেছি না। ইহার একমাত্র কারণ যে কয়েকদিন হইতে আমি উচ্চ রক্তাধিক্য চাপের জন্য চিকিৎসকের নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারিতেছি না।

আমি ১৯৩৮ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর দেহান্তরের পর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করি। তারপর সুদীর্ঘ ১১ বৎসর কাল আচার্য গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকটসান্নিধ্য লাভ করি। তিনি আমাদের অগ্রজ ছিলেন। তাঁহার কাছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষা করিয়াছি। তাঁহার স্মৃতি আমার হৃদয়ে চিরকাল অম্লান থাকিবে।

আপনাদের শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রার্থনা করি। ইতি—

শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—আপনাদের সমিতির চির হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আমাকে স্মরণ রাখিবেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় যাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম! কোন কোন দিক থেকে তাঁকে পথিকৃৎ-ও বলা চলে। বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় তাঁর নিষ্ঠার তুলনা হয় না। তাঁর স্মরণ-সভায় একথা সকলেরই বারংবার মনে পড়বে এবং শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নুয়ে পড়বে। তিনি আমাদের নিকট একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

কিন্তু আর একটি বিষয়েও বিজ্ঞানীদের কাছে তিনি দৃষ্টান্তস্থল। প্রকৃতির মধ্যে আমাদের কত যে অজানা আছে তাকে জানবার জন্যে আগ্রহ বিরল। গবেষণা করতে গেলেই আমরা দামী দামী যন্ত্রের সহায়তার কথাই প্রথম ভাবি। অথচ স্বল্প সম্বল নিয়ে যে কত মৌলিক গবেষণা করা যায় এবং প্রকৃতির রহস্য উন্মুক্ত করা যায়, গোপালবাবুর ছোট বড় সব কাজের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আজ এই সভায় অক্লান্ত বিজ্ঞান সাধক এবং বিজ্ঞান সাহিত্যের সত্যনিষ্ঠ সেবকের পুণ্য স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
২২।৫।৮১

১৮ই মে, ১৯৮১

বিজ্ঞান সাধক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের যে স্মরণ-সভার ব্যবস্থা আপনারা করেছেন, তাতে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি; গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রতিভা তথা কীর্তি দু'দিক থেকে আমার কাছে গভীর দ্যোতনাজনক মনে হয়। প্রথাগত অধ্যয়নের বাইরে থেকেও, নিছক তন্নিষ্ঠার উপর নির্ভর ক'রেও যে বিজ্ঞানবীক্ষণ সম্ভব, নিজের অধ্যবসায় ও কর্ম দিয়ে গোপালবাবু তা প্রমাণ ক'রে গেছেন। তাঁর দৃষ্টান্তে অনেক উত্তরসূরী যথাযথ উদ্বুদ্ধ হবেন। দ্বিতীয় যে-বিষয় উল্লেখ করতে হয় তা তাঁর মাতৃভাষার প্রতি দুর্মর প্রেম. বাংলা ভাষার অনুশাসনেও যে-দুরূহতম বিজ্ঞানচর্চায় বাধা নেই, সেই অহমিকাবোধ। অত্যন্ত গরিমার সঙ্গে দীর্ঘ বছর ধ'রে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা সম্পাদনা ক'রে তিনি সেই অহমিকার পূর্ণতম মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার সতত প্রণাম রইলো।

অশোক মিত্র

আপনাদের পত্রে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির পক্ষ হতে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং "এই স্মরণ-সভায় আপনার উপস্থিতি বিশেষভাবে কাম্য" এই কথাও লিখেছেন। আমার উপস্থিতি উচিত বলে আমিও বুঝতে পারি, বিশেষত যখন গোপালবাবুকে আমি চিনতাম এবং চাকরী জীবনে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যাইতাম এবং গোপালবাবুর সঙ্গে মেলামেশা করিতাম। বিজ্ঞান পরিষদে ও কার্যকরী সভ্য হিসাবেও আরও নিকটভাবে তাঁহাকে ও তাঁহার কার্য দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। সুতরাং স্মরণ-সভায় যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আগামী কাল (১৮।৫।৮১) কলিকাতার বাহিরে যাইতে হইতেছে এবং ফিরিতে প্রায় ২৭।২৮শে মে হইবে। তাই এই পত্রে আমার অনুপস্থিতির কারণ জানাইলাম।

বিজ্ঞান প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু কিভাবে করা যাইবে এটা খুব কঠিন। ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানকে গ্রহণ না করিতে পারিলে ইহা কেবল পুঁথিগত জ্ঞানে পরিণত হয়। আমার ব্যক্তিগত জীবনে এ ব্যাপারে যে চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহাতে বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচার যত সহজ তাহা ব্যবহারিক জীবনে গ্রহণ করান তত সহজ তো নয়ই বরং কঠিন।

শ্রীসুশীলরঞ্জন মৈত্র

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর ডক্টর গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মরণ-সভায় পূর্ব নির্ধারিত কার্যব্যপদেশে যোগদান করিতে না পারার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় এবং সভায় উপস্থিত ডক্টর ভট্টাচার্যের গুণগ্রাহীদের নিকটে অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ঐ সঙ্গে আমি সামান্য এই পত্রযোগে ডক্টর ভট্টাচার্যের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

১৯৪৮ সালে স্বর্গীয় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-সূত্রেই ডক্টর ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং পরবর্তী প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া যথাক্রমে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্পাদক ও লেখক এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্যাকরী সমিতির সদস্যরূপেও সেই পরিচয় ক্রমশঃ অতি হৃদ্যতাপূর্ণ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তিনি তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত বিজ্ঞান সাধনার জন্য যেমন একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন আবার তেমনি তাঁহার সফল বিজ্ঞান সাহিত্য-সাধনার জন্যও পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্রের কৃতী ছাত্র আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুরও স্নেহধন্য বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। কথায় বলে "গেঁয়ো যুগী গাঁয়ে ভিখ পায় না" অক্লান্ত ও নিষ্ঠাবান কর্মী ডক্টর ভট্টাচার্যও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাহা না হইলে বিখ্যাত রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার প্রভৃতির দ্বারা সম্মানিত গোপালচন্দ্রের বিরুদ্ধেও জীবন-সায়াহ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকার জন্য যখন তাঁহার কর্মক্ষেত্র বিজ্ঞান পরিষদেই জেহাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল, তখন আমরা অতীব দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ আমরা খুশি, কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁহার মহাপ্রয়াণের মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁহার বাসভবনে গিয়া রোগক্লিষ্ট গোপালবাবুকে সম্মানসূচক ডি. এস্-সি ডিগ্রীতে ভূষিত করিয়া এই মূঢ়তার উপযুক্ত জবাব দিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরই গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাতে আমার মত তাঁহার গুণগ্রাহী বহু বন্ধুজন খুবই তৃপ্ত হইয়াছেন। কালের অমোঘ বিধানে আজ তিনি মানুষের নিন্দা-বন্দনার অতীত। তবু আমরা চিরকাল একজন সুকৃতী বিজ্ঞান সাধক, সাহিত্যিক ও প্রিয় বন্ধুরূপে তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ করিব ; ভগবানের চরণে তাঁহার অমর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, ইহাই আমাদের সমবেত প্রার্থনা।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনাপঞ্জী

[বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির সব আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি, এখানে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত গোপালচন্দ্রের প্রবন্ধের ('করে দেখ'বাদে) সম্পূর্ণ তালিকা যুক্ত হল। স.]

ভৌতিক আলো	জানুয়ারী, ১৯৪৮
স্টীম এঞ্জিন	আগস্ট
স্টীম টারবাইন	সেপ্টেম্বর
সূচ ও আলপিন তৈরির কথা	অক্টোবর
পরমাণু সম্পর্কে সাঙ্কেতিক ভাষা	অক্টোবর
প্লানেটোরিয়াম	অক্টোবর
জাইরোস্কোপ	অক্টোবর
প্রজাপতির জন্মরহস্য	নভেম্বর
নিব তৈরির কথা	নভেম্বর
সিনক্রোটন	ডিসেম্বর
পরমাণুর শক্তি	জানুয়ারী, ১৯৪৯
মাছ কি খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে ?	জানুয়ারী
সূর্য কলঙ্ক	ফেব্রুয়ারী
মৌমাছির কথা	মার্চ
শিকারী মাছের কথা	এপ্রিল
অদৃশ্য জীবজগতের বিস্ময়	মে
পিঁপড়ের কথা	মে
মশার স্বভাব-শত্রু	জুলাই
ইলেক্ট্রোপ্লেটিং	জুলাই
ঘড়ির কথা	জুলাই
কাঁচপোকার কথা	আগস্ট
কীট-পতঙ্গের লুকোচুরি	সেপ্টেম্বর
পৃথিবীর অতীত যুগের কথা	নভেম্বর
মাদক উত্তেজক অবসাদক ওষুধ	ডিসেম্বর "
রাক্ষুসে মাছ	জানুয়ারী ১৯৫০
পশুপক্ষীর আত্মগোপন কৌশল	মার্চ
অ্যামিবা ও হাইড্রার বিচিত্র কাহিনী	এপ্রিল
শ্রীনিবাস রামানুজন	এপ্রিল
বিজ্ঞানের যাদুকর এডিসন	মে
অধ্যাপক বীরবল সাহানি	জুন
অঙ্কুরোদগমের বৈচিত্র্য	জুন
রেশমের কথা	জুলাই
উদ্ভিদ যাদুকর	জুলাই
ভূমিকম্পের কথা	জুলাই
স্যার সি. ভি. রামন	সেপ্টেম্বর
ফড়িঙের জন্মরহস্য	অক্টোবর
জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল	অক্টোবর
মশার জন্মকথা	নভেম্বর
স্যার রোনাল্ড রস	নভেম্বর
চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান	সেপ্টেম্বর
রোনোৎপত্তির রহস্য নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার গোড়ার কথা	ডিসেম্বর
প্রোটোজোয়ার সন্ধানে	ডিসেম্বর
সিনর গুগ্লিয়েলমো মার্কনি	ডিসেম্বর "
জীবজগতে বৈচিত্র্য উৎপত্তির কারণ কি ?	জানুয়ারী ১৯৫১
পোষা পায়রা	জানুয়ারী
কৃত্রিম উপায়ে অঁকিডফুলের বৈচিত্র্য উৎপাদন	ফেব্রুয়ারী
পঙ্গপালের অভিযান	মার্চ
অতিকায় টিকটিকি	মার্চ
কাঁচপোকা × মাকড়সার লড়াই	এপ্রিল
লক্ষ্যভেদী প্রাণী	মে
সার জন লাবক	মে
আমাদের দেশে মেছোমাকড়সা	জুন
ফ্লাই হুইল বাস	জুলাই
জীবনীশক্তির কথা	জুলাই
বিমানযোগে চন্দ্রলোক অভিযান	আগস্ট
সাইফন	সেপ্টেম্বর
যান্ত্রিক প্রাণী মেসিনা স্পেকুলেট্রিক্স	সেপ্টেম্বর

রচনাপঞ্জী

বাল্‌বশূন্য বৈদ্যুতিক আলো	সেপ্টেম্বর	১৯৫১
সত্যকথা বলানোর ওষুধ	সেপ্টেম্বর	
অ্যাটমবোমা ও হাইড্রোজেন বোমার সংবাদ	সেপ্টেম্বর	
নিম্নস্তরের জীবজগতের প্রজনন রহস্য	অক্টোবর	
ধূলিকণার রহস্যময় ঘূর্ণন	অক্টোবর	
অদ্ভুত ঘড়ি	অক্টোবর	
দ্রুতগামী যাত্রীবাহী ফেরী বোট	অক্টোবর	
অ্যালুমিনিয়ম লণ্ঠ	অক্টোবর	
সার এডওয়ার্ড অ্যাপলটন	অক্টোবর	
পিঁপড়ের কথা	নভেম্বর	
ধূমপান অনিষ্টকর কিনা	জানুয়ারী	১৯৫২
ময়লা বিশুদ্ধ করবার অভিনব যন্ত্র	জানুয়ারী	
আলেয়া	ফেব্রুয়ারী	
ঘুমের নতুন ওষুধ	ফেব্রুয়ারী	
হংসচঞ্চু	মার্চ	
মাছধরা বৈদ্যুতিক জাল	মার্চ	
ঠাণ্ডা আলো তৈরির সম্ভাবনা	এপ্রিল	
অভিনব হেলিকপটার	এপ্রিল	
বিস্ময়কর ওষুধের বিপদ	এপ্রিল	
জন্মনিয়ন্ত্রণের নতুন ওষুধ	জুন	
স্টেথোস্কোপ	মে	
লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি	জুন	
সৌরজগতে চাঁদের সংখ্যা	সেপ্টেম্বর	
আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা	নভেম্বর	
বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ ব্যাধি	ডিসেম্বর	
সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা	ডিসেম্বর	
কলেরার জীবাণু	ডিসেম্বর	
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাছ	মার্চ	
অভিনব এরোপ্লেন পরিকল্পনা	আগস্ট	
উড়ন্ত পিরিচ	অক্টোবর	
এক্স-রে	সেপ্টেম্বর	
ট্রানজিস্টর	জুলাই	
সারস পাখির নৃত্য	অক্টোবর	
কীট-পতঙ্গের অদ্ভুত সংস্কার	ডিসেম্বর	
মাছের সন্তান বাৎসল্য	মে	১৯৫৪
হাইড্রোজেন বোমা	এপ্রিল	"
মানুষের পূর্বপুরুষ	জুন	
মশার আলো	জুন	
গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের পরীক্ষা	জুলাই	
প্রাচীন যুগের অতিকায় ঘণ্ট।	জুলাই	
বিচিত্র সখ্যতা	আগস্ট + সেপ্টেম্বর	
সূতা তৈরি কল আবিষ্কারের কথা	আগস্ট + সেপ্টেম্বর	
শনিগ্রহ	অক্টোবর	
কাঁকড়া বিছার কথা	ডিসেম্বর	
শিকারী উদ্ভিদ	ফেব্রুয়ারী	১৯৫৫
ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বসু	মার্চ	
স্পিরিচুয়ালিজম্ বা প্রেততত্ত্ব		১৯৫৮
কীট-পতঙ্গের দৈহিক শক্তি	জুন	১৯৫৯
বিচিত্র জীব	মে	১৯৬০
অ্যাক্সোলোটলের রূপান্তর	নভেম্বর	১৯৬১
আবিষ্কারের কাহিনী—উড়োহাহাজ	অক্টোবর	১৯৬৬
আকস্মিক আবিষ্কার	জানুয়ারী	১৯৬৭
আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা	মে	১৯৬৯
বিজ্ঞান-সাহিত্যে বাংলা ভাষার অসম্পূর্ণতা	সেপ্টেম্বর + অক্টোবর	১৯৭৮

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত গ্রন্থসমূহ

বাংলার কীট-পতঙ্গ (১৯৭৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত)

করে দেখ (তিন খণ্ডে)

বাংলার মাকড়সা

আধুনিক আবিষ্কার

করে দেখ

গাছের পাতায় ফটোগ্রাফী

কাগজের উপর যেমন ফটোগ্রাফের ছবি তোলা হয়, গাছের পাতার উপরেও ঠিক তেমনি করে ছবি তোলা যেতে পারে। তোমাদের অনেকেই হয়তো কথাটা বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু উপায়টা বলে দিচ্ছি—ধৈর্য ধরে একটু চেষ্টা করে দেখো, সবাই একাজে সাফল্য লাভ করতে পারবে।

যে-কোন রকম হাতে-আঁকা ছবি, হাতের লেখা বা ফটোগ্রাফের ছবি গাছের পাতার উপর তুলতে হবে। গাছের পাতা ছিঁড়ে নেবার দরকার নেই, গাছের গায়ে পাতা যেমনি আছে তেমনি থাকবে। তোমরা হয়তো ভাবছ—পেন্সিল, কালি-কলম বা তুলি দিয়ে পাতার উপর ছবি তোলবার কথা বলছি। কিন্তু মোটেই তা নয়। কাগজের উপর যেমন করে নেগেটিভ থেকে ফটোগ্রাফের ছবি তোলা হয়, পাতার উপরও ঠিক সেই রকমেই ছবি ফুটে উঠবে। এতে কালি, কলম বা রং-তুলির প্রয়োজন নেই। কেমন করে ছবি তুলতে হবে বলছি—

যে সব গাছের পাতা মসৃণ—প্রথম পরীক্ষার সময় সে সব গাছই বেছে নেবে। কারণ প্রথমেই খস্‌খসে বা উঁচু শিরা তোলা পাতা নিয়ে সুবিধা করতে পারবে না। এজন্যে প্রথমে গুঁড়ি কচুর পাতা, ক্যানাফুল বা ট্রপিউলাম প্রভৃতির পাতা বেছে নিতে হবে। তাছাড়া ছবি তোলবার জন্যে এমন জায়গার পাতাই বেছে নেওয়া দরকার, যেগুলি সারা দিনই কিছু না কিছু আলো পায়। আবার খুব কড়া রোদ হলেও প্রথম প্রথম সুবিধা করতে পারবে না। এখন ছোট ছোট দু'খানা সাদা কাচ সংগ্রহ করে বেশ পরিষ্কার করে নেবে। কাচ দুখানা চার ইঞ্চি চৌকো বা তার চেয়ে ছোট হলেও চলবে। একখানা কাচের উপর চাইনিজ ইঙ্ক বা ওই রকমের কোন ঘন কালো কালি দিয়ে যে কোন রকম ছবি আঁক বা নাম সই কর। কিছুক্ষণ রোদে রাখলেই কালিতে আঁকা ছবি বা লেখাটা শুকিয়ে যাবে। যে পাতাটার উপর ছবি বা তোমার নাম তোলবার ইচ্ছা, সে পাতাটার উপর নাম সই-করা বা ছবি-আঁকা কাচখানা চাপা দাও। আঁকা দিকটা উপরে থাকবে। অপর সাদা কাচখানাকে পাতাটার নীচে রেখে কাঠের ছোট ছোট ক্লিপ দিয়ে পাতাসমেত উপর ও নীচের কাচ দু'খানা এমনভাবে চেপে রাখ যেন উপরের কাচ ও পাতার মধ্যে কোন ফাঁক না থাকে, অথচ পাতাটাও জখম না হয়। কাচের ভারে পাতাটা যাতে ছিঁড়ে না পড়ে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা রোদ পাবার পর কাচ দু'খানা খুলে ফেললেই দেখবে—পাতার গায়ে তোমার আঁকা ছবি বা নাম অবিকল ফুটে উঠেছে।

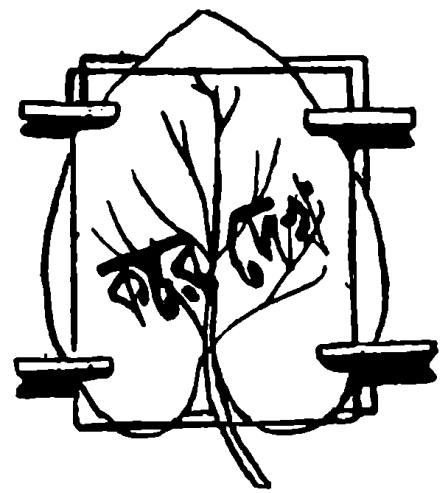

কোন্ পাতায় কতক্ষণ রোদ লাগানো দরকার সেটা তোমরা পরীক্ষা করে ঠিক করে নেবে। কোন কোন অবস্থায় হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছবি ফুটে উঠবে, কোনটাতে আবার একদিন-দুদিনও লাগতে পারে। ফটোগ্রাফের যে কোন একখানা নেগেটিভ এভাবে পাতার উপর চাপিয়ে দিলেও দেখবে, ফটোগ্রাফের ছবিটি পাতার উপর ফুটে উঠেছে। কিন্তু লক্ষ্য রাখবে, রোদ খুব কড়া না হয়। কড়া রোদে কাচ তেতে গিয়ে পাতাটাকে ঝল্‌সে দিতে পারে। কাচ ছাড়া যে কোন স্বচ্ছ জিনিসে ছবি এঁকেও এভাবে পাতার গায়ে তার ছাপ তোলা যেতে পারে। একটু পুরু কালো কাগজে নক্সা কেটে নিয়ে তাকে পাতার উপর বসিয়ে দিলেও কিছুক্ষণ রোদ পাবার পর হুবহু সেই নক্সা পাতার গায়ে ফুটে উঠবে।

ব্যাপারটা কেমন করে ঘটে মোটামুটি একটু বুঝিয়ে বলছি। ঘাসের উপর ইট বা কোন কিছু পদার্থ চেপে থাকলে কিছুকাল পরে তুলে ফেললে দেখা যায়—চাপা-পড়া ঘাসগুলি সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। তার মানে, রোদ না পেলে গাছের পাতার সবুজ রংটা তৈরি হয় না। কাচের গায়ে কালো কালিতে ছবি আঁকার ফলে কালির

রেখাগুলির ভিতর দিয়ে পাতার গায়ে রোদ পড়তে পারে না। কাজেই যে জায়গাটায় রোদ পড়ে, সেটা বেশ সবুজই থাকে কিন্তু রোদ না-পাওয়া জায়গাগুলি ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হতে থাকে। এ-কারণেই সবুজ পাতার উপর ফ্যাকাশে বা ফিকে সবুজ রঙের ছবি দেখা যায়।

আয়োডিন সলিউশনে ডুবিয়ে অবশ্য এই ছবিগুলোকে ফটোগ্রাফের ছবির মত স্থায়ী করা যায়; কিন্তু তাতে পাতাটাকে জীবন্ত অবস্থায় রাখা চলে না। অবশ্য অতটা না করেও তোমরা সোজাসুজি পাতার গায়ে ছবিটাকে ফুটিয়ে তোলবার পরীক্ষাটা করে দেখতে পার।

ডুবুরি মাছ

তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে—অনেক মাছেরই পেটের ভিতরে শিরদাঁড়ার নীচে বাতাসভর্তি একরকম পট্‌কা থাকে। ইংরাজীতে এটাকে বলে—'সুইমিং ব্লাডার'। মাছ তার পেশীর সাহায্যে এই পট্‌কাকে সংকুচিত বা প্রসারিত করে ইচ্ছামত ডুবে যেতে পারে অথবা ভেসে থাকতে পারে। খুব সহজ একটা পরীক্ষায় তোমরা এই ধরনের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পার।

বড় মার্বেলের মত একটা ফাঁপা কাচের বল যোগাড় কর। গ্লাস-ব্লোয়ারদের কাছে এরকমের অনেক বাতিল কাচের বল পাবে। অথবা তাদের দিয়ে অনায়াসেই এরকমের একটা ফাঁপা বল তৈরি করে নিতে পার। বলটার তলার দিকে বোঁটার মত একটু অংশ থাকবে। ওই বোঁটার পাশে, অর্থাৎ বলের নীচের দিকে ছোট্ট একটা ফুটো রাখতে হবে। কাচ দিয়েই হোক বা প্লাস্টেসিন দিয়েই হোক, ছোট্ট-একটা মাছ তৈরি করে কাচের বলটার বোঁটার সঙ্গে ছবির মত করে জুড়ে দাও। এছাড়া একটা কাচের গ্যাস-জার অথবা মোটা টেস্ট-টিউব যোগাড় করতে হবে। গ্যাস-জার বা টেস্ট-টিউব না পেলে মোটা-মুখ, খাটো গলাওয়ালা বোতলেও কাজ চলবে। বোতল অথবা গ্যাস-জারের প্রায় গলা অবধি জল ভর্তি করে তাতে কাচের বল সংলগ্ন মাছটাকে ছেড়ে দাও। ফাঁপা বলটা জলের উপরে অনেকটা ভেসে থাকবে। ড্রপারের সাহায্যেই হোক, কি জলের কলের নীচে ধরেই হোক—বোঁটার পাশের ফুটার ভিতর দিয়ে বলটার মধ্যে খানিকটা জল ভর্তি করে আবার সেটাকে জলে ছেড়ে দাও। যদি জল বেশী ভর্তি হয়ে থাকে তবে মাছ সমেত বলটা এবার ডুবে গিয়ে জলের তলায় চলে যাবে। ডুবে গেলে ঝাঁকুনি দিয়ে বল থেকে খানিকটা জল বের করে এমন অবস্থায় আনবে যাতে বলটা জলের উপর সামান্য একটু মাত্র ভেসে থাকে। বোতল বা জারের মুখে এবার একটা রবারের পাত বেঁধে বা রবারের ছিপি এঁটে দিয়ে তাতে জোর করে একটু চাপ দিলেই দেখবে—বল-সংলগ্ন ভাসমান মাছটা জলের তলায় ডুবে যাবে। চাপ ছেড়ে দিলেই মাছটা আবার জলের উপর ভেসে উঠবে। ছিপির উপর চাপ দিলে বোতলের বাতাসের উপর চাপ পড়ে। সেই চাপে খানিকটা জল ফুটো দিয়ে ফাঁপা বলটার ভিতরে ঢুকে যায়। জল ঢোকবার ফলে বলটা আগের চেয়ে খানিকটা ভারী হয় বলেই জলের নীচে তলিয়ে যায়। চাপ ছেড়ে দিলেই সেই জলটুকু আবার বেরিয়ে আসে এবং মাছসমেত বলটাও জলের উপর ভেসে ওঠে।

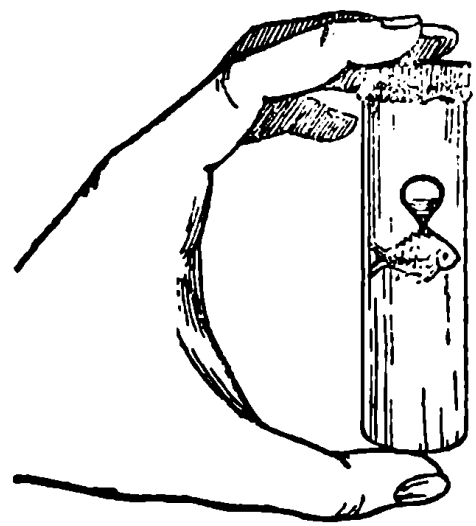

তোমার বন্ধুদের কাছে পরীক্ষাটা দেখাবার সময় মাছটাকে ডুবতে বললেই ডুবে যাবে; আবার ভাসতে বললেই ভেসে উঠবে। এই সঙ্গে দেওয়া ছবির মত ব্যবস্থায় জিনিসটাকে করে দেখো—অজানা লোকেরা দেখে ভাববে—মাছটা যেন তোমারই কথামতই ওঠানামা করছে!

গোপালচন্দ্রের জীবনে দেবেন্দ্রমোহন বসু

সুবীর ভট্টাচার্য

"বাংলা ভাষায় গোপালচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি ফ্যাবারের রচনাবলীর সঙ্গে তুলনীয়; কিন্তু ফ্যাবারের রচনাবলী যেমন ইংরেজী ভাষায় আরও বৃহৎ দরবারে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সার্থক অনুবাদক Alexander Teixeria de Mattos, গোপালবাবুর এ লেখাগুলি তেমনি ইংরেজীতে অনুবাদ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম অথবা আদৌ নেই, আর সেজন্যই বিশ্বের অন্য ভাষাভাষীরা হবেন বঞ্চিত।"

গোপালচন্দ্রের 'বাংলার কীট-পতঙ্গ' প্রকাশিত হবার পর শ্রীঅজয় হোম সম্পাদিত 'প্রকৃতি'-র ১৯৭৫-র নভেম্বর সংখ্যায় ঐ বই-র আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছিলেন অধ্যাপক রতনলাল ব্রহ্মচারী। ফ্যাবারে ও গোপালচন্দ্রের তুলনা যে-প্রসঙ্গে যে-দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অধ্যাপক ব্রহ্মচারী করেছিলেন কোনোক্রমেই তাকে ঔপনিবেশিক হীনমন্যতা-বোধজাত তুলনাবলীর উদাহরণ হিসেবে ফেলা সম্ভব নয়। উদ্ধৃতিটি দিয়ে লেখা শুরু করবার কারণ, একটি ছোট্ট ঘটনা যা গোপালচন্দ্র নিজেই বিবৃত করেছিলেন বছর পাঁচ/ছয় আগে।

ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু তখন বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে মাঝে-মধ্যে আসতেন। তাঁর সঙ্গে গোপালচন্দ্রের আলাপ-পরিচয় হয় নি। কিন্তু গোপালচন্দ্র তাঁকে চিনতেন। "একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে···একমনে পোকা-মাকড় সংগ্রহ করছিলাম, অলক্ষিতে কখন ডক্টর বোস এসে নিমগাছের আসনটিতে বসেছিলেন, মোটেই টের পাইনি। হঠাৎ তিনি আমাকে ডেকে বললেন—আপনি ফ্যাবারের বই পড়েছেন? অসম্মতিসূচক জবাব দিতেই তিনি বললেন·····পড়ে দেখবেন—নিজের চোখে দেখে কতরকম কীট-পতঙ্গের ক্রিয়া-কৌশল, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কত অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।" (দ্র, ডঃ দেবেন্দ্রনাথ বোস। গোপালচন্দ্র। সমকালীন। কার্তিক, ১৩৮২)

হয়তো কেন, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় গোপালচন্দ্র ফ্যাবারের সঙ্গে পরিচিত হতেনই। কিন্তু সেদিনও গোপালচন্দ্র জানতেন না, অপরিচিত এক যুবকের পোকা-মাকড় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করে যিনি অযাচিতভাবে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনিই কিছুদিন বাদে হবেন তাঁর ভবিষ্যৎ গবেষণার কাণ্ডারী। ফ্যাবারের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু ফ্যাবারে নিঃসন্দেহে তাঁকে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল। কারণ, তখন কীট-পতঙ্গ সম্পর্কে যে-সব বই-পত্র পাওয়া যেত, তাঁর অধিকাংশই ছিল গুরু-গম্ভীর। ফ্যাবারের যে স্বাদ, তা তাতে ছিল না। আর সে-সময়ে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, কীট-পতঙ্গ নিয়ে গবেষণার কোনো অ্যাকাডেমিক কদরই ছিল না।

একটি ছোট্ট ঘটনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে, যে আজ থেকে ৩০/৪০ বছর আগেই মূলত কীট-পতঙ্গ বিষয়ে লিখে গোপালচন্দ্র কি-রকম খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

"আমরা একবার একটি পিকনিকে গিয়েছিলাম। সেখানে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের···গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। আমরা যে বাড়িতে গিয়েছিলাম সেখানকার উঠান আগাছায় ভর্তি হয়ে গেছে এবং বহু পিঁপড়ে ও মাকড়সা সেখানে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছিল। এগুলো ভালো করে দেখবার লোভ বৈজ্ঞানিক গোপাল-বাবু সম্বরণ করতে পারলেন না উঠানের উপর উবু হয়ে বসে নিবিষ্টচিত্তে সব দেখতে লাগলেন।

এমন সময় অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে প্রশ্ন করলেন, ও ভদ্দরলোক ওখানে কি করছেন?

আমার জনৈক বন্ধু উত্তর দিলেন, পিঁপড়ে দেখছেন। বিমলাবাবু বললেন, ওঃ তারপরে কিছুদিন পরে দেখা যাবে ভদ্দরলোক গোপাল ভট্টাচার্যের মতো পিঁপড়ে সম্বন্ধে প্রবাসীতে প্রবন্ধ লিখছেন।" পর্যবেক্ষণ শেষে গোপালচন্দ্র আসবার পর "যে-বন্ধুটি আগে কথা বলেছিলেন তিনি বললেন: বিমলা, তোমার সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দিই। ইনি গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। (দ্রঃ যুগান্তরে শ্রীসুধাংশু চৌধুরীর ৫·১·৪৭-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ)

এই মজার গল্পটি শোনা যেত না, যদি না, আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং পরে, বিশেষ করে দেবেন্দ্রমোহন এই বৈজ্ঞানিককে শিক্ষা ও নির্দেশ না দিতেন।

দেবেন্দ্রমোহন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ডিরেক্টর হয়ে আসবার আগেই গোপালচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। গোপালচন্দ্রের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সম্পাদনা-কর্মে ডঃ বোসের সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। যে-কথা

গোপালচন্দ্রের মুখেই শোনা। এক সময় বিজ্ঞান পরিষদের দপ্তর ছিল বিজ্ঞান কলেজে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের কামরায়। আর 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর দপ্তর ছিল গোপালচন্দ্রের বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা ঘরে। একদিন গোপালচন্দ্রের ডাক এলো ডিরেক্টর ডি. এম. বোসের ঘরে। ডিরেক্টরের ঘরে গিয়ে গোপালচন্দ্র শুনলেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে যে, তাঁর ঘরে সব সময়ই এত লোক আসে, তাতে অন্যদের অসুবিধা হয় আর তিনি নাকি গবেষণার কাজ মুলতুবি রেখে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' করছেন। সেদিন গোপালচন্দ্র তাঁর শিক্ষক ডি. এম. বোসের অন্য এক পরিচয় পেয়েছিলেন। ডি. এম. বোস সেদিন তাঁকে এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যা করছেন, তা করে যেতে বলেছিলেন।

ডঃ প্রমথনাথ নন্দী দেবেন্দ্রমোহনের শ্রাদ্ধবাসরের জন্য যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন গবেষণার কয়েকটি নূতন ধারা অবলম্বন করে কার্যে ব্রতী হবার জন্য তাঁর যেসব সহকর্মীদের উৎসাহিত করতেন তাঁদের মধ্যে ডঃ জেকব ও শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম ছিল উল্লেখযোগ্য।

গোপালচন্দ্রের উদ্ভিদ নিয়ে কাজ করবার বাসনার কথাও জানতেন। ফলে, তখন তিনি ভাবলেন যে, লজ্জাবতী, নেপচুনিয়া, স্প্যাগাজিনি, কামরাঙা প্রভৃতি স্পর্শকাতর উদ্ভিদ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্তগুলি আরো দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। তখন তিনি এ-কাজে গোপালচন্দ্রকে ডেকেছিলেন। গোপালচন্দ্রের পরীক্ষা, দেবেন্দ্রমোহনের কাম্য ফলের বিপরীত হওয়ায়, ডঃ বাসুদেব ব্যানার্জীকে দিয়েও ঐ পরীক্ষা করান। তাতেও একই ফল হয়। গোপালচন্দ্রের নিজের কথায় 'পরীক্ষার ফল দেখে ডক্টর বোস বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে এতোটা বিচলিত হতে আর কোনদিনই আমি অন্তত দেখিনি।' (দ্রঃ সমকালীন, কার্তিক, ১৩৮২) গবেষণা বন্ধ হলেও এই গবেষণার ফলাফল তিনি ট্রানজ্যাকশনে প্রকাশ করলেন গোপালচন্দ্র, বি. ব্যানার্জীর সঙ্গে নিজ স্বাক্ষর সহ। যা প্রমাণ করে গবেষণাটির গুরুত্ব কতটা? (দ্রঃ On the Chemical Natute of the Substancy which are (i) Effective in the Trarnsmission of Excitation in Mimosa pudica, and (ii) 'Active' in the Contraction of its Pulvins. By B. Banerji, G. Bhattachary and D. M. Bose. Transactions. VOI. XVI. 1944-46)

ব্যাঙাচি নিয়ে যখন গোপালচন্দ্রের গবেষণা মাঝপথে তখন তাঁর অবসর গ্রহণের সময় হয়। কিন্তু তাঁর গবেষণা যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য ড. বোস গভর্নিং বডিকে সুপারিশ করেন। অবসর নেবার পরও যাতে গোপালচন্দ্র গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন সে ব্যবস্থাও করেছিলেন ড. ডি. এম. বোস। ১৯৭১ সালে ষাঁড়ের গুঁতোয় আহত হয়ে বিছানা নেবার আগে পর্যন্ত গোপালচন্দ্রের সঙ্গে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সম্পর্ক ছিল।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ডক্টর শশাঙ্কচন্দ্র ভট্টাচার্য গোপালচন্দ্রকে হীরক জয়ন্তী রৌপ্য পদক প্রদান করছেন
ফোটো : দেবব্রত মণ্ডল

তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বসু বিজ্ঞান মন্দিরের হীরক-জয়ন্তী রৌপ্য পদক ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে।

ড. ডি. এম. বোস ও দু-চারজন সহকর্মী বৈজ্ঞানিকের বাইরে গোপালচন্দ্র পেয়েছিলেন অবজ্ঞা, বিরূপ ব্যবহার। তিনি ছিলেন হরিজন বৈজ্ঞানিক। আর বোধহয় এ কারণেই গোপালচন্দ্রের বন্ধু-বান্ধবরা ছিলেন সব সাহিত্য-জগতের মানুষ। তাঁদের মধ্যেই তিনি পেতেন অবসরের আনন্দ। তাঁর পদ্মাপারের কথার টান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোঁটা-তিলক হীনতা সত্ত্বেও এঁদের কাছে পেয়েছিলেন তিনি বন্ধুত্ব, স্নেহ ও স্বীকৃতি। বাংলা দেশের বিজ্ঞানীরা নন, বাংলাদেশের সাহিত্যিকরাই এক বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞানীর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছেন। গোপালচন্দ্রও বোধহয় তা স্বীকার করেছেন 'বাংলার কীট-পতঙ্গ' পরিমল গোস্বামীকে এবং 'করে দেখ'-র শেষ খণ্ড শ্রীশঙ্করদাশঙ্কর রায় ও শ্রীমতী লীলা রায়ের করকমলে উপহার দিয়ে।

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

বাস্তবের মুখোমুখি

সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনতা যুগে যে শহর কলকাতা সমগ্র ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের ঔদাসীন্য ও অবহেলায় চারদিক থেকে স্তূপীকৃত নৈরাশ্য তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইচে।

এই শহরের সমস্যা চিত্র যেমন বিশাল তেমনি ভয়াবহ। আলোবাতাসহীন অন্ধকার নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি, খোলা নর্দমা, খাটো পায়খানা, স্তূপীকৃত আবর্জনা, রাতে মশা দিনে মাছি, পথ কুকুর, ছাড়া গরু, পানীয় জলের অভাব, ফুটপাথের বাসিন্দা, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, ট্রাফিক জ্যাম, হকারি, মস্তানি, ভণ্ডামি, ভেজাল ওষুধ, মদের চোরাকারবার, জুয়া, অপসংস্কৃতি সব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অতলান্ত গহ্বরের দিকে।

কিন্তু তবু এই কলকাতায় নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে থেকেই জীবনের শত সহস্র আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে। খেলার মাঠে, ময়দানের সভায়, পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশাবাদী মানুষ, সরকার যদি উদ্যোগী হয় তাহলে মানুষ ধৈর্য্য ধরতে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত। তাই আমাদের আবেদন:

(১) জলের অপচয় করবেন না। কলের মুখ ে দেখলে বন্ধ করে দেবেন।

(২) নির্দিষ্ট পাত্রে ছাড়া রাস্তায় কোথা ফেলবেন না।

(৩) রাস্তার বাতিস্তম্ভ থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি ঘৃণ্য অপরাধ।

(৪) দেওয়ালে কুৎসিৎ কিছু লিখবেন না।

(৫) ফুটপাথ পথচারীদের, এখানে কায়েমী স্বত্ব গড়ে তুলবেন না।

(৬) রাজস্ব আদায় সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি: কর বাকী ফেলবেন না।

(৭) ভেজালকারীদের চিহ্নিত করে সংগঠিতভাবে তার শাস্তি দাবি করুন।

গঠনমূলক সমালোচনা এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করবে।

কলিকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মবালী

গ্রাহকদের জন্য :

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। **under certificate of posting**-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- **M. O.** বা **Bank Draft KISHOR JNAN-BIJNAN**-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

শারদসঙ্কলন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
পুরস্কৃত

পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির - ৮১

পরিচালনায় : দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল

SAB

• প্রশংসা পত্র •

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় দি সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল আয়োজিত ও কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির - ৮১ অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষায় অতি সুন্দর ও সুপরিকল্পিত সহকারে বিজ্ঞান পত্রিকা "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" প্রকাশে সুদৃঢ় পদক্ষেপ ও বিজ্ঞান প্রসারে মানসিকতার উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মাননীয় শ্রী রবীন বল মহাশয়কে এই সম্মানমূলক প্রশংসাপত্র অর্পিত হইল।

চিত্তব্রত মজুমদার
চেয়ারম্যান
পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির-৮১
ও
মন্ত্রী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা।